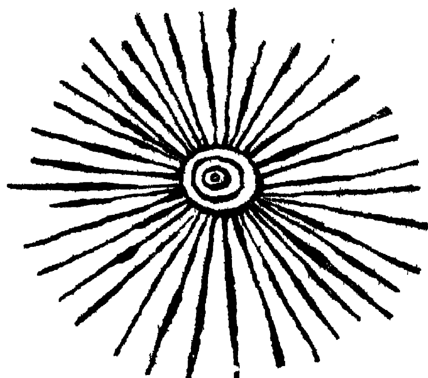


গ্রীষ্মবাসর

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

গ্রীষ্মবাসর

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

ত্রিবেণী প্রকাশন
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : মাঘ—১৩৬৬

প্রকাশক

কানাইলাল সরকার

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর

দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস

দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং (প্রাইভেট) লিঃ

২৮, বেনিয়াটোলা লেন

কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী

পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রচ্ছদ ব্লক

সিগনেট ফোটোটাইপ

ব্লক-মুদ্রণ

স্কোয়ার প্রিণ্টার্স

বাঁধাই

তয়েফুর আলী মিঞা অ্যাণ্ড ব্রাদার্স

দাম : দু টাকা পঁচাত্তর নয়াপয়সা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

এই লেখকের ঃ

॥ উপন্যাস ॥

মীরার দুপুর

বারোঘর এক উঠোন

নীলরাত্রি

গোলাপের নেশা

সূর্যমুখী

॥ গল্পগ্রন্থ ॥

বন্ধুপত্নী

শালিক কি চড়ুই

প্রিয় অপ্রিয়

জয় জয়ন্তী

পার্বতীপুরের বিকেল

একটা নীল মাছি কোথা থেকে ছুটে এসে বিরক্ত করছে। বিরক্ত হয়ে ও ছোট্ট একটা হাই তুলল। হাই তুলতে গেলে ওর চোখ বুজে যায়। চোখ বুজে যায় আর পাতলা সরু ঠোঁটের ওপিঠের সুন্দর শ্রেণীবদ্ধ সাদা দাঁত ক'টা বেরিয়ে পড়ে। ওপরের সারির দাঁতে কোনও খুঁত নেই। নীচের পাটির সামনের দাঁত দুটোর মাঝখানে একটুখানি ফাঁক—তা-ও খুব বড় না, একটা বড় দানার মসুরডাল গলতে পারে এমন। কিন্তু এটাই ওর খুঁত—রূপের ত্রুটি। জয়তী জানে। অত্যন্ত সচেতন ও তার এই দাঁত দুটো সম্পর্কে। তাই—তাই কথা বলতে, হাসতে, বুঝি কাঁদতে গিয়েও ও পারতপক্ষে ঠোঁট ফাঁক করে না। আজ না—সেই ছোটবেলা থেকে। দুধের দাঁত পড়ে গিয়ে নতুন করে যেদিন দাঁত উঠেছিল সেদিন থেকে। সেদিন কে প্রথম ওকে বলেছিল বিশ্রী দাঁত দুটোর কথা? মা? বাবা? নাকি আয়নায় মুখ দেখতে গিয়ে ও নিজে আবিষ্কার করেছিল এটা। মনে নেই জয়তীর।

জয়তী এখন অবশ্য দাঁতের কথা ভাবছে না। এত বড় হাঁ করে ও হাই তুলল। একলা ঘরে কে আর ওকে দেখছে। বিরক্ত হচ্ছে মাছিটাকে নিয়ে। হাতের ছুরি ও আনারসটা কাচের প্লেটের ওপর নামিয়ে রেখে টেবিলের ওপাশ থেকে ভিজে তোয়ালেটা টেনে এনে ও হাতের রস মুছল। হাত দিয়ে চুল ঠিক করল। চুল ঠিক করতে করতে ও কান খাড়া করে ধরল। আর একটা গাড়ি এল না?

আসুক। অনেক গাড়ি এসেছে। আরও আসবে। মোটে তো বেলা এখন তিনটে। জয়তী হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে আবার ছুরি ও আনারসটা তুলে নেয়। কিন্তু তুলে আবার তখনি

আবার সব প্লেটের ওপর নামিয়ে রেখে নীল মাছিটার সন্ধানে নিজে এদিকে ওদিকে চোখ ঘোরায়। এতক্ষণ প্লেটের ধারে আনারসের হলদে টুকরোগুলো ঘিরে নাচানাচি করছিল। জয়তীর হাত নড়তে সরে গেছে। মৃদু ভনভন শব্দটা কানে আসছে ওর। কিন্তু কোথায় গেল! জয়তী বুঝল তার মাথার ওপর চুলের কাছে, হয়তো চুলের সঙ্গে লেগে ওড়াওড়ি করছে। ভালো আশ্রয়। শ্রাবণের মেঘের মতো কালো একমাথা চুল নিয়ে জয়তী বসে আছে বলে—না তুই সেখানে গিয়ে গা-ঢাকা দিতে পারছিস। মনে মনে হাসল জয়তী। হাসল আর ভুরু-দুটো কুঁচকে ভাবল যদি হঠাৎ এখন এ-ঘরে ঘোষাল উঁকি দেয়, জয়তীকে ধমকে সারা করে দেবে। 'কিন্তু আমার তো দোষ নেই।' জয়তী ঠোঁট না খুলে হেসে উত্তর করবে। 'একটু আগে চাকর এসে সারা ঘর-বারান্দায় ফ্লিট ছড়িয়ে গেছে। দুপুরের আগে লাইজল দিয়ে ঘরের মেঝে, বারান্দা, বাইরের সিঁড়ি পর্য্যন্ত ধুয়ে মুছে গেছে। এখন মাছি যদি আসে রুখবে কে। পাকা আনারসের মিষ্টি গন্ধ মাছিকে টেনে এনেছে হয়তো—'

ঘোষাল। ডাক্তার। বস্তুত সাহিত্য-সভায় ডাক্তার আসে কেন, জয়তী ভাবল। ভাবতে ভাবতে হাত বাড়িয়ে ছুরি তুলে নেয়। আনারসের বড় টুকরোর মাঝখানে ছুরি বসিয়ে আবার ভাবে ও। ছুরি নড়ে না আনারস নড়ে না। জয়তীর দু'হাত নিশ্চল। পলকহীন চোখ দুটো মেলে রেখে মনে মনে বলল ও, 'কেবল ডাক্তার তো না, ডাক্তারের মত আরও অনেকের কাছে নিমন্ত্রণ-পত্র গেছে। কাল সারা দুপুর বাবার কাছে বসে খামের ওপর গুচ্ছের নাম লিখেছি ঠিকানা লিখেছি। বাবা বলে গেছে আমি লিখেছি। বাবার বলা হয়ে গেছে পর মা বলেছে আর এক গুচ্ছের নাম। মা শেষ করেছে পর তপতী বলেছে আরও ক'টা নাম। নাম-ঠিকানা লিখতে লিখতে আমার হাত ব্যথা করছিল।' কিন্তু ব্যথা করলেও জয়তী বিরক্ত হয় নি। যেমন এখন হচ্ছে না। এতগুলো আপেল ছাড়িয়ে

কেটে প্লেটে প্লেটে সাজিয়ে রেখে আনারস কাটতে আরম্ভ করল তো ও! আনারস কাটা শেষ করে পেঁপেগুলো ধরবে। এক ডজন পাকা পেঁপে আনা হয়েছে কাল। পেঁপের খোসা ছাড়ানোয় কষ্ট কম। কষ্ট দিচ্ছে আনারস। মাছিটা আবার নেমে এল না। হাতের ছুরি তুলে জয়তী 'হুস' করে ওঠে।

॥ দুই ॥

একসঙ্গে মিঃ রায় ও মিসেস নাগ সহ ডক্টর নাগ সচ্চিদানন্দবাবুর লাইব্রেরী-ঘরে ঢুকলেন। সচ্চিদানন্দবাবু আরামকেদারা ছেড়ে ঠিক উঠে দাঁড়ান না। দাঁড়াবেন মনে করে সোজা হয়ে বসে দু'হাত কপালের কাছে ঠেকান। তারপর হাত বাড়িয়ে সামনের চেয়ারগুলো দেখিয়ে হাসেন : 'নমস্কার, নমস্কার, বসুন।'

ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ রায় দু'হাত একত্র করে প্রত্যাভিবাদন জানান। ডক্টর নাগ শুধু মাথা নাড়েন। মিসেস নাগ মধুর হাসি ছড়িয়ে সচ্চিদানন্দবাবুর অভ্যর্থনার উত্তর দেন। পরনে কালো জমির রূপালী পাড়ের শাড়ি, সূর্যমুখী রঙের ব্লাউজ। হাতের বটুয়ার রঙটাও হলদে। সাদা জুতো। ফরসা উঁচু নাকে রিমলেস চশমা। স্বামী শহরের নামকরা বিজ্ঞানের অধ্যাপক। মিসেস নাগ উচ্চশিক্ষিতা তো বটেই—সাহিত্যে অগাধ উৎসাহ। যেন তাঁর জন্যই ডক্টর নাগের এই সাহিত্যের মজলিসে আসা। অবশ্য সচ্চিদানন্দবাবু দুজনকেই নিমন্ত্রণ করেছেন। কিন্তু মিসেস নাগ মনে করেন, যদি এড়াবার ছুতো বার করতে পারত তো তাঁর স্বামী এবারও আসত না। কিন্তু এবার না এসে উপায় কি। বিশেষ করে মিসেস নাগের দীর্ঘদিনের চেষ্টার পর বাংলাদেশের একটা প্রথম-শ্রেণীর সাময়িক পত্রিকায় একটা 'ওরিজিন্যাল' ছোটগল্প বার করার পর।

'আমি পড়েছি…আমি ঠিক পড়ি নি। তপতী পড়ছিল, আমি শুনছিলাম।' সচ্চিদানন্দবাবু মিসেস নাগের দিক থেকে চোখ সরান না। মিসেস নাগ তেমনি মধুর হাসিটি ধরে রেখে চেয়ারে বসেন। বটুয়াটা কোলের ওপর রাখেন। তিনি অনুমান করেছিলেন এ-বাড়িতে পা দিতে-না-দিতে সচ্চিদানন্দবাবু তাঁর গল্পের কথা তুলবেন।

'আপনার কেমন লাগল মিঃ গুপ্ত ? তপতী কি বলল গল্পটা পড়ে ? কোনও ডিফেক্ট ? একটু বড় হয়ে গেছে, না ?'

'বেশ হয়েছে।' এতগুলো প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে সচ্চিদানন্দবাবু মিসেস নাগের দিক থেকে তাঁর ভাঁটার মত বড় বড় চোখ দুটো চট্ করে সরিয়ে নিয়ে মিঃ রায়ের দিকে তাকালেন। রোগা মানুষ মিঃ রায়। মাথার চুল যৎসামান্য অবশিষ্ট আছে। শুকনো হাড়ালো চোয়াল। কালো ফ্রেমের পুরু চশমার ফাঁক দিয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক মিসেস নাগের দিকে তাকিয়ে আছেন, কথা শুনছেন। সচ্চিদানন্দবাবু এবার তাঁকে দেখছেন বুঝতে পেরে ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে মিঃ রায় ঘাড় ঘুরিয়ে বাঁধানো দাঁত ক'টা বার করে বিনীতভাবে হাসলেন।

'এখন কেমন আছেন ?'

'খুব ভালো না। কাল আবার কষ্ট পেয়েছি।'

ব্লড-প্রেসারে ভুগছেন সচ্চিদানন্দবাবু। মিঃ রায় সেই প্রশ্ন করছেন। অনুমান করে সচ্চিদাদন্দবাবু তার জবাব দিয়ে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করেন : 'আপনি ? কেমন আছেন আজকাল।'

'ভালো না' একটু জোর দিয়ে কথা বলার দরুন অধ্যাপকের বাঁধানো দাঁত নড়ে ওঠে। 'আমার অসুখ সারবার নয়। আরথ্রাইটিস কখনও সারে !'

যেন ক্ষণকাল চুপ থেকে কথাটা ভাবেন সচ্চিদানন্দবাবু, তারপর আড়চোখে মিঃ রায়ের পাশে বসা ডক্টর নাগের মুখ পরীক্ষা করে তিনি মৃদু মৃদু হাসেন।

'ওই যে-ক'দিন জোড়াতালি লাগিয়ে কাটে—বুঝলেন না ?' আরথ্রাইটিসের রুগী মিঃ রায়ের শীর্ণ ঠোঁটে হাসি উঁকি দিল। সচ্চিদানন্দবাবু তাঁর রোমশ মোটা হাত তুলে মিঃ রায়কে যেন চুপ করতে ইঙ্গিত করলেন, তারপর প্রচণ্ড শব্দ করে হেসে উঠলেন।

'বৈজ্ঞানিক রাগ করবেন আপনার কথা শুনে—ডক্টর নাগ গম্ভীর হয়ে গেছেন দেখতে পাচ্ছেন মিঃ রায় ?'

সচ্চিদানন্দবাবুর উচ্চ হাসি ও কথা শুনে মিঃ রায় আবার একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ে আড়চোখে পাশের চেয়ারের বৈজ্ঞানিককে দেখেন। লক্ষ্য করে মিসেস নাগ হাসেন।

যেন তাতে কিছুটা উৎসাহ পান ঐতিহাসিক ঘাড় ঘুরিয়ে সচ্চিদানন্দবাবুর চোখের দিকে তাকান।

'সায়েন্স, মেডিকেল সায়েন্স অসম্ভবকে সম্ভব করছে আমি অস্বীকার করব না—কিন্তু, কিন্তু আমার মনে হয় অসুখ-বিসুখ সারানোর ব্যাপারে কেবলই ডাক্তার আর তার ওষুধই সব না, রুগীর বিশ্বাসটাও অনেক কাজ করে—তা না হলে—'

'তবে আপনিও একটু একটু বিশ্বাস করুন—আরথ্রাইটিস সারে না ধরে নিয়ে অতটা হতাশ হচ্ছেন কেন!' সচ্চিদানন্দবাবু এবার আর তত শব্দ করে হাসেন না।

'না, আমার মনে হয় মিঃ রায় বলতে চাইছেন ওই রোগের কোন ভালো ওষুধ বেরিয়েছে বলেই তিনি বিশ্বাস করছেন না।' মিসেস নাগ তর্কের মীমাংসা করে দিতে পেরেছেন মনে করে প্রফুল্ল চোখে সচ্চিদানন্দবাবু ও পরে মিঃ রায়ের মুখ দেখেন।

ঐতিহাসিক প্রচণ্ডবেগে মাথা নাড়লেন।

'ঠিক তা নয়! এমন রুগী আমি দেখেছি যে চোখের ওপর দেখল ওষুধটা আর একজনের কাজ দিয়েছে, অথচ সে মনে করছে তার নিজের বেলায় এটা কাজ দেবে না—এবং সত্যি দেখা গেল একই ওষুধ ব্যবহার করে সে যেমন ভুগছিল তেমনি ভুগছে, এক্ষেত্রে আপনারা কী বলবেন।'

সবাই নীরব। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন।

'কাজেই বিজ্ঞান বিজ্ঞান করে আমরা যতই লাফাই না কেন, আমার তো মনে হয় বিশ্বাসকে বিসর্জন দিয়ে তার খুব বেশি দূর এগোবার ক্ষমতা নেই, ইতিহাস বলে—'

এবার ডক্টর নাগ বাধা দেন। এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন।

ছোটখাটো মানুষটি। তাঁর স্ত্রী দেখতে যেমন ফরসা তিনি তার উল্টো। বড় বেশি কালো গায়ের রঙটা। মিসেস নাগ দীর্ঘাঙ্গী। ডক্টর নাগ বেঁটে কৃশকায়। কিন্তু রোগা হলেও ঐতিহাসিকের মত বিরলকেশ নন। মাথায় ঝাঁকড়া ঘন চুল। সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবি গায়ে। কাঁধের ওপর একটা ভাঁজকরা মুগা-রঙের শাল। পরনে শান্তিপুরী ধুতি। ডক্টর নাগের পোশাক এটা নয় যদিও। সচ্চিদানন্দবাবু ধুতি-পাঞ্জাবিতে বৈজ্ঞানিককে এই প্রথম দেখছেন। ইতিপূর্ব্বে বাইরের দু-দুটো কন্‌ফারেন্সে ডক্টর নাগকে তিনি টাই-স্যুটে দেখেছেন। এটা সংস্কৃতি-সম্মেলন, সাহিত্য-মজলিস—এখানে বিদেশী পোশাক চলবে না। বোধ করি এই কারণে তিনি খাঁটি বাঙালী সেজে এসেছেন। সচ্চিদানন্দবাবু ভাবলেন। অবশ্য স্বামীকে এই বেশ পরাতে বাড়িতে যে কত কথা কাটাকাটি হয়েছে, মিসেস নাগকে কী ভীষণ রাগারাগি করতে হয়েছে এখানকার গৃহস্বামী তা জানেন না। মিসেস নাগ যদি জিদ না করতেন ডক্টর নাগ নিশ্চয় তাঁর চিরকালের কোট-পেণ্টুলন পরে সাহিত্য-সভায় আসতেন। আর মিসেস নাগের মাথা কাটা যেত। মিসেস নাগ কি আড়চোখে স্বামীর ঢিলে-হাতার ধবধবে পাঞ্জাবি ও কাঁধের সুন্দর শালটা দেখে তাই ভাবছেন?

ডক্টর নাগ সরাসরি ঐতিহাসিকের চোখের দিকে তাকান। মৃদু গলায় অথচ প্রত্যেকটা কথার ওপর জোর দিয়ে বললেন, 'বিশ্বাস বিসর্জন দিয়ে বিজ্ঞান এগোতে পারে না। বিশ্বাস নিয়েই তার কাজ। পুরনো পচা অন্ধবিশ্বাস ভেঙে চুরমার করে দিয়ে সে নতুন বিশ্বাস গড়ে তোলে।'

'হিয়ার, হিয়ার—' লাইব্রেরী-ঘর সরগরম হয়ে উঠল। যেন বারান্দা থেকে বৈজ্ঞানিকের কথা শুনতে পেয়ে বাহবা দিতে দিতে ভিতরে ঢুকলেন বিপুলদেহ পিনাকী সোম। সচ্চিদানন্দবাবুর কলেবর বিরাট। কিন্তু পিনাকী তাঁকে ছাড়িয়ে গেছেন। শহরের

নামী পাবলিশার। সচ্চিদানন্দ এবার শুধু আরামকেদারায় বসে থেকে দু'হাত একত্র করেন না। মোটা শরীরটা টেনে তুলে উঠে দাঁড়ান ও পাবলিশারের সঙ্গে করমর্দন করেন: 'আহা, কী আনন্দ হচ্ছে তোমাকে দেখে! তুমি যে সময় করে এখানে আসতে পারবে আমার কিন্তু মন বলছিল না। তবু তপতীর মা বলল, চিঠি পাঠিয়ে দাও, নিশ্চয় আসবেন। দশ মিনিটের জন্যে হলেও সোম একবার উঁকি না দিয়ে পারবেন না।'

'হ্যাঁ, সিজন আরম্ভ হয়েছে, একটু ব্যস্ত—তা তোমার বাড়ির নেমন্তন্ন কোনদিন আমি মিস করেছি বলেও তো মনে পড়ে না। সাহিত্য না বুঝি, খাওয়ার লোভটা তো ছাড়তে পারি না—হা-হা—'

'থাক অত বিনয়ের কাজ নেই, তুমি সাহিত্য বোঝ না, গলা বড় করে যত খুশি বলতে পার—কিন্তু আমরা বিশ্বাস করছি না। সোম প্রকাশনী বাংলাদেশের সেরা সাহিত্যকদের বই ছাপছে, কাজেই মুড়ি কোন্‌টা মিছরি কোন্‌টা টনটনে জ্ঞান আছে তোমার—পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি—পিনাকী সোম, কলকাতার বিখ্যাত সোম-পাবলিশার্সের মালিক—শ্রীসুধাবিন্দু রায়—ইতিহাসের অধ্যাপক—গোল্ড-মেডালিস্ট, নাম শুনে থাকবে—ডক্টর নবারুণ নাগ—ফিজিক্সের চেয়ার—'

'নমস্কার, নমস্কার।'

'নমস্কার।'

'আমি চিনি, এঁদের সকলের সঙ্গেই আমার পরিচয় আছে।' পিনাকী সচ্চিদানন্দবাবুর দিকে চোখ ঘোরায়। সচ্চিদানন্দবাবু তখনও বলে যাচ্ছেন: 'ডক্টর নাগের স্ত্রী—শ্রীমতী চামেলী নাগ, নতুন লিখতে আরম্ভ করেছেন---'

পিনাকী চেয়ারে বসল।

বস্তুত এঁরা প্রায় সকলেই একদিন না একদিন সোম-প্রকাশনীর

দরজায় উঁকি দিয়েছেন, পিনাকীকে দেখে নতুন করে সকলের মনে পড়ল। একদিন না, তাঁর কলিঙ্গ-যুদ্ধের ওপর লেখা এমন চমৎকার গবেষণামূলক মূল্যবান বইয়ের পাণ্ডুলিপি নিয়ে পিনাকী সোম সাত মাস ফেলে রেখে তারপর ফেরত দেয়, এবং বেশ কিছুদিন সুধাবিন্দুকে পিনাকীর কাছে হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছিল। 'গল্প-উপন্যাস ছাড়া আমি এখন কিছু ছাপব না'---শেষদিন পিনাকী বলেছিল। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা ইতিহাসের অধ্যাপকের নতুন করে মনে পড়ল। তাই পিনাকীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সুধাবিন্দু একটু বেশি গম্ভীর হয়ে গেছেন। গম্ভীর হয়ে আছেন নবারুণ। বিজ্ঞানের ওপর তিনি কোনও বই লেখেন নি এবং সে রকম কিছু ইচ্ছাও তাঁর নেই। পিনাকীর কাছে যেতে হয়েছিল নবারুণ নাগকে চামেলীর চাপে পড়ে। একটা ছোটগল্পের বই বার করার জন্য ক্ষেপে উঠেছিল তাঁর স্ত্রী। একটা গল্পও কোনোদিন কোনও সাপ্তাহিক, মাসিক বা দৈনিক কাগজের পৃষ্ঠায় প্রকাশ (সেদিন প্রথম 'মহিলা-প্রতিভা' মাসিক, চামেলীর একটা গল্প ছেপেছে) করতে পারে নি চামেলী। কিন্তু তাতে কি, আমার গল্পের মেরিট ওরা এখনও ধরতে পারছে না। একটা সংকলন বেরোক। সবগুলো গল্প এক জায়গায় একটা বইয়ে থাকলে রুচিবান এবং বুদ্ধিমান পাঠকের চোখে পড়বেই। এবং তখন আমার লেখার কদর হবে। স্ত্রীর কথামতন গল্পের পাণ্ডুলিপি নিয়ে নবারুণ সোম-প্রকাশনীর দরজায় ছুটে গেছেন। গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছেন প্রথম দিনই। পাণ্ডুলিপির ওপর বিষণ্ণ চোখ রেখে মাথা নেড়ে পিনাকী সোম সেদিন বলেছিল, 'ছোটগল্প অচল। উপন্যাস নিয়ে আসুন। কালই আমি আপনার স্ত্রীর উপন্যাস ছাপতে পারি। আছে কি---এক-আধটা আরম্ভ করেছেন তিনি ?'

নবারুণ মাথা নেড়ে সোম-প্রকাশনীর দরজার চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাইরে নেমে এসেছিলেন। পিনাকী তাঁকে বসতে পর্যন্ত বলে নি। অথচ নবারুণ শহরের কতবড় নামজাদা বিজ্ঞানের অধ্যাপক। এমন ভান

করল পিনাকী সেদিন, যেন নাম শোনে নি, জানে না। মনে মনে ভীষণ অপমানিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে নবারুণ বাড়ি ফিরেছিলেন। আর তার পর থেকে চামেলী লাফাচ্ছিল আজই সে উপন্যাসে হাত দেবে, পনেরো দিনের মধ্যে একটা ছোট উপন্যাস লিখে ফেলবে, লিখে পিনাকীর কাছে যাবে। পিনাকীর সঙ্গে নিজে দেখা করবে। উপন্যাসে চামেলী হাত দিয়েছে কিনা নবারুণ জানেন না। তবে, এখন, এইমাত্র পিনাকীকে দেখে নবারুণের যেমন দু'কান গরম হয়ে উঠেছে, চামেলীর দু'চোখ অপরূপ হাসির ছটায় উজ্জ্বল হয়ে গেছে। সচ্চিদানন্দরবাবু সঙ্গে কতক্ষণে কথা শেষ হবে পিনাকীর, আর অমনি সে কথা বলতে আরম্ভ করবে ভেবে চামেলী যে ছট্‌ফট্ করছে বুঝতে কষ্ট হয় না নবারুণের। নবারুণ তাতে আরও বেশি ক্ষুব্ধ হন ক্রুদ্ধ হন। ওদিকে ক্রুদ্ধ চোখে সুধাবিন্দু পিনাকীর জয়ঢাকের মত বিশাল পেটটা দেখতে-দেখতে চিন্তা করছিলেন, এই ইডিয়টগুলি সংসারে বেঁচে আছে কেন।

'তা, একলা এলে, মিসেসকে সঙ্গে আনলে না কেন?' সচ্চিদানন্দবাবু দুঃখিত হয়ে যেই বলতে গেছেন, পিনাকী ঘাড় কাত করেছে। 'এসেছে এসেছে, সভা-সমিতি কোনদিনই ওর পছন্দ নয়, তা তুমি জান, – এসে গাড়ি থেকে নেমেই বলল, তুমি লাইব্রেরি-ঘরে গিয়ে বোস, আমি গুপ্তগিন্নীর কাছে আছি। সভার এখনও দেরি আছে।'

'ও, এসেছেন।' নিশ্চিন্ত হন সচ্চিদানন্দবাবু। 'সরাসরি ভিতরে চলে গেছেন, তা ভালো, ভালো, হা-হা।' সচ্চিদানন্দবাবু আর বসেন না। 'আপনারা বসুন। আমি এখনি আসছি। সোমগিন্নীর সঙ্গে দেখাটা সেরে আসি –'

সচ্চিদানন্দবাবু বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পরাশর ডাক্তার ভিতরে ঢুকল। পরাশরের সঙ্গে তার বন্ধু নীলাদ্রি চক্রবর্তী। বাংলাদেশের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। চল্লিশ পার হয়ে গেছে বয়স। রগের চুল পাকতে আরম্ভ করেছে। তা করুক। চোখে মুখে চলায়

বলায় বুঝিয়ে দিচ্ছে নীলাদ্রি এখনও তরুণ। সাদা সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে। পায়ে সাদা স্ট্র্যাপের চটি। একটু নীলচে মতন চশমা চোখে। তাই চোখের আসল রঙ বোঝা যায় না। মনে হয় নীলাদ্রির ইচ্ছা নয় লোকে তার চোখ দেখে বুঝুক সেখানে কখন কোন্ রঙের খেলা চলছে। সেটা সে বুঝিয়ে দেয় তার গল্পে উপন্যাসে। যেমন বোঝা গেছে তার 'রোদের কান্না', 'বৃষ্টির ঝুমুর', 'চৈত্র-ব্যথা' প্রভৃতি উপন্যাসে। এখন কী লিখছে কে জানে। একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল লাইব্রেরি-ঘরে। নীলাদ্রিকে প্রায় সবাই চেনে। এই মুখের ছবি অনেকবার অনেক কাগজে ছাপা হয়েছে। নীলাদ্রি বেঁটে। পরাশর উঁচু লম্বা পুরুষ। চাঁছা ঘাড়। মাথায় সাড়ে বারো আনা চুল পেকে গেছে। কঠিন চোয়াল। 'ডাক্তারের কাঠখোট্টা চেহারার সঙ্গে চশমার পুরু চওড়া ফ্রেমটা মানিয়েছে বেশ'---ডক্টর নাগের পিছনের চেয়ারে বসা কবি প্রভুদয়াল ভাবছিল। একমাত্র ডাক্তারই এখানে ধুতি-পাঞ্জাবির ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে। পাতলুন ও হাওয়াই শার্ট পরে সাহিত্য-সভায় এসেছে। 'তা ছাড়া উপায় কি', চামেলী আস্তে বললেন, 'এখন যদি কোনও জরুরী কল আসে সাহিত্য-সভা ছেড়ে ডাক্তারকে রুগীর বাড়ি ছুটতে হবে---কাজেই পোশাকটা একরকম রাখতে হয়।'

'তা তো বুঝলাম।' ফিসফিসে গলায় নবারুণ বললেন, 'ডাক্তার কি সাহিত্য করে? সাহিত্যের আসর বসলেই পরাশর উপস্থিত থাকবে কে যেন সেদিন বলছিল।'

'আমাদের মতন গল্প-উপন্যাস লেখে না। তবে টমাটোর আবদার, শশার শালীনতা, বেগুনের চুলবুলি, দধির উদারতা, ডিমের ঢেঁকুর ইত্যাদি নাম দিয়ে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রায়ই কাগজে ছোট বড় প্রবন্ধ লিখছে। বেশ ঝরঝরে ভাষা। সাহিত্যগুণও আছে। কাজেই সব সাহিত্যের মজলিশেই তার নেমন্তন্ন থাকে।'

স্ত্রীর কথা শুনে নবারুণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'তোমার মতন কেবল ল্যাবরেটরি আর বই নিয়ে কেউ পড়ে থাকে না। বিজ্ঞানের ওপর ছোট ছোট বেশ সহজ ভাষায় দুটো-একটা প্রবন্ধ লিখতে পারতে—এতে আর যাই হোক দুটো পয়সা আসত ঘরে। কিন্তু তুমি তো আমার কথা শুনবে না!' চামেলীর দীর্ঘশ্বাস শুনে নবারুণ আরও বেশি গম্ভীর শক্ত হয়ে যান। চামেলী অবশ্য তা গ্রাহ্য করেন না। পাবলিশার পিনাকী সোম নীলাদ্রি চক্রবর্তীর সঙ্গে কথায় মেতে আছে, নিশ্চয় আর একটা উপন্যাস খসাবার মতলব। অবাক অসহায় চোখে চামেলী হাঁ করে তাই দেখছেন। মাথাটা একটু পিছনের দিকে হেলিয়ে দিয়ে ঐতিহাসিক সুধাবিন্দু প্রবীণ কবি প্রভুদয়াল বসু-মল্লিকের সঙ্গে এই নিয়ে নিচু গলায় কথা বলছিলেন। 'কেবল উপন্যাস—উপন্যাস! এই করে বাংলা সাহিত্য রসাতলে যাচ্ছে। বিজ্ঞান না, ইতিহাস না, অর্থনীতি না, সমাজ না, শিল্প না—আজেবাজে উপন্যাসে বাজার ছেয়ে যাচ্ছে—দেখবেন এর পরিণাম!'

কবি বসু-মল্লিক চোখ বুজে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেললেন। তারপর চোখ খুলে অধ্যাপকের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসলেন।

'নীলাদ্রির কোনও বই আপনি পড়েছেন?'

'আমি ও সব স্পর্শও করি না।' সুধাবিন্দুর শীর্ণ রোগা মুখ কুঁচকে এতটুকু হয়ে গেল। 'সস্তা নাটক নভেল ছাত্রাবস্থায়ই পড়ি নি, আর এখন তো--আমি মনে করি শরৎ চাটুয্যের পর আর কারুর উপন্যাস লেখা উচিত হয় নি। কেন না তিনি এত বেশী কাঁদাকাটার মালমশলা রেখে গেছেন যা আমাদের হজম করতে আরও পঞ্চাশ বছর লাগবে।'

'মোটেই না।' প্রভুদয়াল মাথার বাবরিতে দোলানি দিয়ে শ্রীচৈতন্যের ভঙ্গিতে মৃদু হাসলেন। 'সে-সব অল্‌রেডি হজম হয়ে গেছে, এখন আমরা নতুন রকমের কাঁদাকাটা, মন-দেওয়া-নেওয়া চাইছি, তাই তো একালের নীলাদ্রিরা বুদ্ধি করে তাতে ক্রাইমের ভিয়েন দিচ্ছে—শুধুই নিরামিষ ভালবাসাবাসি না দেখিয়ে খুন জখম ধর্ষণ—'

'চুপ চুপ।' বোধকরি বসু-মল্লিকের বন্ধু, পাশের চেয়ারে বসে খবরের-কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছিল, প্রভুদয়ালের হাতে মৃদু চাপ দিল। 'ওঁরা তো এখানেই দাঁড়িয়ে আছেন। শুনতে পাবেন।'

'শুনুক, গলা বড় করে এসব বলবার সময় এসেছে।' ইতিহাসের অধ্যাপক কবি-বন্ধুকে শুনিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। 'বাজে উপন্যাস এঁরা লিখছেন আর ওঁরা ছাপছেন।' ইঙ্গিতে পিনাকী ও নীলাদ্রিকে দেখিয়ে দিয়ে সুধাবিন্দু বললেন, 'দুজনেই সমাজের অপকার করছে, দুজনেই সমাজের চোখে সমান অপরাধী—স্টেট থেকে এসব বই ব্যান করা উচিত, এসব প্রকাশালয় বন্ধ করে দিলে হোত।' রোগা মানুষ সুধাবিন্দু উত্তেজনায় কাঁপছিলেন।

একটু জোরে বলার দরুন চামেলী কিছু কিছু কথা শুনেছেন। সুধাবিন্দুর দিকে ঘাড় কাত করে হঠাৎ তিনি বলে ফেললেন, 'তা যাই বলুন মিঃ রায়, নীলাদ্রির চার-চারটে বই সিনেমা-কোম্পানিগুলো কিনে নিয়েছে—'

'সিনেমা হওয়াটা বড় কথা নয়।' পিছন থেকে প্রভুদয়াল বললেন, 'একটা বই পর্দায় রূপায়িত হলেই যে সাহিত্যের আসরে সে বই কৌলীন্যের টিকিট পেয়ে গেল এমন মনে করা ভুল। একটা ট্র্যাশ গল্পও পর্দার ছবি হিসাবে সার্থক শিল্পের শিরোনামা পেতে পারে। এবং সেই সার্থক ছবির পিছনে থাকে পরিচালক, একগুচ্ছের অভিনেতা-অভিনেত্রী, ক্যামেরামেন, আলোকশিল্পী এবং আরও অনেকে। সিনেমা একটা আলাদা আর্ট।'

'আপনি এ নিয়ে চমৎকার প্রবন্ধ লিখতে পারেন। বেশ মূল্যবান জিনিস হবে।' অধ্যাপক গম্ভীর হয়ে বললেন। প্রভুদয়ালের বন্ধু ঘাড় কাত করল, 'তাই তো আজকাল লিখছে প্রভুদয়াল। তেরো বছর বয়স থেকে কবিতা লিখতে আরম্ভ করে আজ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে এসে কম দুঃখে কি আর কবিতা ছেড়ে দিয়ে প্রবন্ধ লিখছে! তবু দুটি পয়সা পাচ্ছে। কবিতা লিখে একদিনের বাজার-খরচ চালাবার

মতন টাকাও সে কাগজের সম্পাদকের কাছ থেকে কোনোদিন পায় নি।'

'আর এই বত্রিশ বছর ধরে যদি তিনি কেবল হাবিজাবি মাথামুণ্ডু যা-তা সব উপন্যাস লিখে যেতেন, নীলাদ্রির মতন গাড়ি বাড়ি করে ফেলতে পারতেন।'

বাবরি ছুলিয়ে চোখ বুজে প্রভুদয়াল লম্বা নিশ্বাস ফেললেন। অধ্যাপকের এ-কথায় কোনও মন্তব্য প্রকাশ করলেন না।

'একালের নীলাদ্রিরা উপন্যাসে ক্রাইমের ভিয়েন দিচ্ছে আবার অন্যরা, যেমন ধরুন—ব্যোমকেশ গাঙ্গুলী, মোহিত মণ্ডল, অনাদি সাহার দল রাজনীতি-সমাজনীতির কড়া মশলার সঙ্গে জীবন-দর্শনের গব্যঘৃত ঢেলে দিয়ে উপাদেয় সব উপন্যাস পাক করে নামাচ্ছেন।' হেসে প্রভুদয়ালের বন্ধু মন্তব্য করল। কথা শুনে ডক্টর নাগ এই প্রথম হাসলেন।

'সেইজন্যই ডিসপেপসিয়াটা বেড়ে গেছে।'

'কার? পাঠকদের নিশ্চয়?' বিড়বিড় করে চামেলী বললেন, 'তোমার সে ভয় নেই, তুমি তো আর উপন্যাস পড় না।'

স্ত্রী চটে গেছে এসব আলোচনা শুনে ডক্টর নাগ বুঝতে পারেন বইকি। যদি ইডিয়ট পাবলিশারটাকেও শোনাতে পারতেন, ভাবেন তিনি।

॥ তিন ॥

পার্ক স্ট্রীটের ওপর ইঞ্জিনিয়ার সচ্চিদানন্দ গুপ্তর হালপ্যাটার্ণের তিনতলা বাড়ি ছুপুর থেকে গমগম করছে। বাড়ির সামনে প্রশস্ত বাগান ও গ্যারেজের মাঝখানে সবুজ জমিটা এখন আর চেনা যায় না। ছোট-বড় সাদা কালো নীল সবুজ ধূসর নানা রঙের গাড়ি জমা হয়ে আছে। কোন্‌টা কার গাড়ি চেনা যায় না। দরকারও নেই চিনে। আনারস কাটা শেষ করে জয়তী একবার জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে এ-পর্যন্ত কত মানুষ বাড়িতে ঢুকল বুঝে রাখল শুধু।

জয়তী মনে মনে হাসল। বস্তুত এই ছু'বছরেই বাড়ির হাওয়া কী ভীষণ বদলে গেছে টের পাচ্ছে সে!

অবশ্য তপতীর জন্যই এসব হচ্ছে।

জয়তীর বোন। জয়তীর চেয়ে তিন বছরের ছোট। কলেজে পড়ছে। কলেজের সেকেণ্ড-ইয়ার এবার তপতীর। সামনে এগজামিন। কিন্তু এগজামিনের ভাবনা তপতীর যেমন নেই, তেমনি নেই বাবা-মার।

অদ্ভুত সুন্দর সব গল্প লিখছে তপতী। কলেজে ঢুকে এটা হয়েছে। আগে বোঝা যায় নি। তপতী কোনদিন গল্প-উপন্যাস লিখতে পারবে বিয়ের আগে জয়তী বোঝে নি, বুঝতে পারে নি। তখন তপতী স্কুলে নাইন ক্লাসে পড়ত না? তিন বছরের বড় হলেও জয়তী টেন ক্লাসে পড়ত, আর পড়তে পড়তে তো তার বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পর একবার শুধু মার চিঠিতে ও জানতে পারে তপতী গল্প লিখতে আরম্ভ করেছে। ছোটগল্প। তার প্রথম গল্পটাই

কলেজের ম্যাগাজিনে ছাপা হয়ে গেছে। কলেজে সোরগোল পড়ে গেছে। একরত্তি মেয়ে এমন সুন্দর গল্প লিখতে পারে! প্রোফেসাররা অবাক হয়ে গেছেন। আর কলেজের কত ছেলে যে বাড়িতে আসছে! ফোর্থ-ইয়ারের বড় বড় ছেলেরা বাড়িতে এসে তপতীর মার সঙ্গে বাবার সঙ্গে দেখা করে বলছে তপতী একটা জিনিয়াস। এই বয়সে এমন গল্প যার হাত দিয়ে বেরোয়! তপতীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। বাংলাদেশে তো বটেই, কন্টিনেণ্টেও কোনও মেয়ে এত অল্প বয়সে, সবে আরম্ভ করেই, এমন আশ্চর্য গল্প লিখতে পেরেছে কিনা জানা যায় না। তপতী আমাদের কলেজের গৌরব।

মার চিঠি পেয়ে জয়তী অবাক হয়ে তপতীর মুখটা ভাবছিল। নাইন ক্লাসেও ইজের ফ্রক পরত তপতী। হয়তো টেন ক্লাসেও। কলেজে ঢুকে নিশ্চয় ফ্রক ছেড়ে ও শাড়ি ধরেছে। শ্বশুরবাড়ি বসে জয়তী সেদিন ফ্রক-পরা তপতীকেই চোখেব সামনে দেখছিল। লজেন্স-চকলেট নিয়ে দিদির সঙ্গে ঝগড়া করে, নিজের রবারটা পেন্সিলটা স্কুলে হারিয়ে এসে দিদিবটা নিয়ে টানাটানি—রাত্রে দোতালার পুবদিকের ঘরে দুজনের এক-বিছানায় শোয়া—ঘুমের মধ্যে তপতার সেই দাঁত-কটকটানি—কী বিশ্রী শব্দ! আর রোদ ওঠার পরেও তপতীর ঘুমিয়ে থাকা। জয়তী সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে পড়তে বসেছে। মা তপতীকে ডাকছে, ডাকতে ডাকতে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে। পার্কে বেড়ানো সেরে বাড়ি ফিরে সচ্চিদানন্দবাবু মেয়েকে ডাকছেন, ডেকে ডেকে বিরক্ত হয়ে গেছেন। 'দরকার নেই ওকে পড়িয়ে। স্কুলে নাম কাটিয়ে দাও। বেলা দুপুর পর্যন্ত পড়ে পড়ে যে মেয়ে ঘুমোবে তার আবার পড়াশোনা! ঠিক ফেল করবে ও।' বাবা বলত। বাবার কথাগুলো জয়তীর সেদিন মনে পড়ছিল। আর সেই তপতী এখন কলেজে তো পড়ছেই--নামকরা একজন লেখিকা। তপতী একটা ছোট উপন্যাস লিখে শেষ করে এনেছে।

জয়ন্তী তাই ভাবছে দু'বছরে কত পরিবর্তন হয়ে গেছে এ-বাড়ির। বিধবা হয়ে গত ফাল্গুন মাসে সে এখানে আসে। মা বলেছিল আবার পড়তে। কিন্তু জয়ন্তীর ইচ্ছা নেই। যাকগে, জয়ন্তীর আর কেন পড়াশোনা করতে ইচ্ছা হয় না, বা কী করতে ইচ্ছা হয় এ নিয়ে সে মাথা ঘামাচ্ছে না। বিশেষ করে এখন, আজকের দিনে। বাইশে ফাল্গুন সে এখানে আসে। তার ক'দিন আগে সাতুই ফাল্গুন একটা সাহিত্য-সভা ডাকা হয়েছিল। সেটা ছিল 'বসন্ত-সন্ধ্যা'। আজকের মত সেদিনও চিঠি ছেপে জ্ঞানী-গুণীদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। এবারের চিঠিতে অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয়েছে 'গ্রীষ্ম-বাসর'। তারপর বুঝি ডাকা হবে 'বর্ষা-মজলিশ'। কার জন্যে এত আয়োজন, এসব অনুষ্ঠান? প্রশ্নের উত্তর পেতে জয়ন্তীর কষ্ট হয় কি! বাবা ইঞ্জিনিয়ার মানুষ। এখন রিটায়ার করেছেন যদিও। কিন্তু সারাজীবন যাঁর কলকব্জা, স্টিম, ইলেক্‌ট্রিসিটি নিয়ে কাটল তাঁর বাড়িতে ঘনঘন এ-ধরনের সাহিত্য-সম্মেলন ডাকার মূলে রয়েছে তপতী, তপতীর লেখা। তপতীর কাছে শুনেছে ও 'বসন্ত-সন্ধ্যা'য় শহরের কোন্ কোন্ লেখক এসেছিলেন এবং লেখিকারা। কবিতা গল্প যেমন পড়া হয়েছে, তেমনি ইতিহাস বিজ্ঞান সমাজনীতি অর্থনীতি পল্লী-স্বাস্থ্য কুটীর-শিল্প ইত্যাদির ওপর কম রচনা-প্রবন্ধ পড়া হয়নি। হুঁ, একালের লেখক-লেখিকারা যেমন সভায় উপস্থিত ছিলেন তেমনি সেকালের, মানে এ-যুগের চোখে যাঁরা প্রাচীন পুরনো অচল হয়ে গেছেন, তাঁদেরও ডাকা হয়েছিল। তপতীর ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তপতীর ইচ্ছা তো সব নয়। কলেজের সহপাঠী-সহপাঠিনীদের কাছে তপতী একটা গল্প লিখে বাহবা কুড়োতে পারে। কিন্তু পুরনো অচল বলে যাঁদের অবজ্ঞা করা হয় তাঁরা, দেশের বরেণ্য সুধী শিল্পীরা তপতীর লেখার কতটা মূল্য দেন তা জানতে দোষ কি? তাঁদের মতামত জানতে হবে। তপতী অসন্তুষ্ট হয়েছিল। এ-যুগের একটি ছেলের একটি মেয়ের জীবনবোধ, আদর্শ ও স্বপ্নের সঙ্গে সে-যুগের মানুষের

জীবনবোধ, জীবনের ধ্যান-ধারণার আকাশ-পাতাল ব্যবধান থাকাই তো স্বাভাবিক। তা হলেও—

সচ্চিদানন্দবাবু মেয়েকে বুঝিয়েছেন, 'তা হলেও মানুষ, 'মানুষ'। মানুষের কতকগুলি ধর্ম, কতকগুলি আদর্শ চিরকালের সত্য বহন করে। এবারও যখন পুরনোদের ডাকা নিয়ে তপতী আপত্তি করতে গেছে বাবা বুঝিয়েছেন, যেমন ধর মাতৃত্ব, দাম্পত্যপ্রেম, জীবে দয়া, সহ-অবস্থান, অহিংসা—এগুলোর পরিবর্তন হয়েছে কি? না হাজার হাজার বছর আগে মা যেমন ছেলেকে ভালবেসেছে, ভাই যেমন ভাইকে ভালবেসেছে, স্বামী যেমন স্ত্রীকে ভালবেসেছে, আজ তার একটিরও ব্যতিক্রম ঘটল কি? সুতরাং এমন কতকগুলো জিনিস আছে যা চিরকালের সত্য। পুরনোরা যে চোখে দেখেছেন, যেভাবে কথার পর কথা সাজিয়ে সে সব ছবি এঁকে গেছেন, তোমরা সে সব জিনিসই আঁকবে আশা করা অন্যায় কি? অবশ্য আঁকার ভঙ্গি, দেখার ধরনটার মধ্যে 'উনিশ-বিশ' পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু তা হলেও'—জয়তী পাশে দাঁড়িয়ে বাবার কথা শুনছিল। তপতী চুপ করে ছিল। যেন চুপ করে থেকেও ভাবছিল, আঁকার ভঙ্গি, দেখার ধরনের মধ্যে তাঁদের সঙ্গে উনিশ-বিশ না, হাজারকোটি পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে আমাদের এই ক'বছরেই—ক'টা বছরের মধ্যেই মানুষের মন, সমাজের চেহারা সভ্যতার রূপের কত পরিবর্তন হয়েছে তুমি কি বুঝতে পারছ না, বাবা? তপতীর গম্ভীর মুখ দেখে মা এগিয়ে এসেছিল। বাবা বলেছিলেন, 'গেল বারের ফাংশানে তোর 'দৃষ্টি' গল্প শুনে সবাই প্রশংসা করলেন। প্রাচীনপন্থী, আধুনিকপন্থী সকলেই তো খুশী হয়েছিলেন। তোর গল্পের নায়িকা এমন এক মেয়ে, যে সকল যুগের মানুষের শ্রদ্ধা-ভালবাসার পাত্রী। তাই লিখেছিল না পরদিন 'যুগসন্ধি' কাগজে? অথচ যুগসন্ধি কাগজের সম্পাদক যে অত্যন্ত গোঁড়া রক্ষণশীল সকলেই জানে। হুঁ, তোদের সেই আধুনিক কাগজ, কী যেন নাম?'—'আকাশ' তপতী বাবাকে মনে করিয়ে দিতে বাবা বললেন, 'সেখানেও তোর

গল্পটার প্রশংসা বেরিয়েছে। কাজেই তোর তো ভয় নেই। আধুনিক-আধুনিকাদের সঙ্গে প্রাচীন-প্রাচীনাদের ভাবধারা, চিন্তাদর্শের মিলন যখন তুই তোর গল্পের মধ্যে দেখাতে পারিস, তখন তোর মার নেই। সেবার আমাদের দেশের এ-যুগের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ব্যোমকেশ গাঙ্গুলী, প্রবীণ কবি প্রভুদয়াল এবং বয়োজ্যেষ্ঠ লেখক যতজন উপস্থিত ছিলেন, আমাকে একবার না, বার বার করে বলে গেলেন।' বাবা চুপ করতে মা বলেছিল, 'এবার নাকি ওর লেখাটা একটু অন্যরকমের। ও আশঙ্কা করছে তোমার ব্যোমকেশ-প্রভুদয়ালের দল তার লেখার নিন্দা করবে।' মার কথায় বাবা হেসে বলেছিলেন, 'একটু একটু নিন্দা সমালোচনা তো হবেই। ওদের সবটাই ভালো আর এদের, মানে তপতীদের, সবটা খারাপ আমিও অবশ্য স্বীকার করি না। এই জন্যেই তো দু'পক্ষের একত্র হয়ে আলোচনার দরকার। এর গলদ ও দেখাবে, ওর ত্রুটি এ বার করবে। আমার মনে হয় সাহিত্য-আলোচনার সার্থকতা এখানে।' মা চুপ করে যায়। তপতী আর কিছু বলে না। শোবার আগে কাল রাত্রে জয়তী তপতীর লেখার খানিকটা পড়ে ফেলেছিল। পড়ে হেসেছিল। বুদ্ধিমতী তপতী দিদির হাসি দেখে অনুমান করে নিয়েছিল গল্পের নায়িকা রুনিকে দিদি প্রায় চিনে ফেলেছে। তবু বাজিয়ে দেখতে ও বলেছিল, 'কুড়ি বছরেরর রূপসী মেয়ে আমার গল্পের নায়িকা।'

'হুঁ, বুঝেছি।' জয়তী বলেছিল, 'কুড়িটা বসন্তের আগুন দু'চোখে জ্বলছে রুনির।'

'হুঁ, আর বুকে কুড়িটা চৈত্রের জ্বালা।' তপতী হেসেছিল। 'এত জ্বালা নিয়ে রুনির দিন কাটে কি!'

'কাটছে।' জয়তী বলেছিল, 'আমার তো মনে হয় বেশ কাটাচ্ছে ও। বৈধব্যের সাদা পোশাক এঁটে অসংবৃত যৌবন বেঁধে রেখেছে, নিরামিষ আহার খেয়ে মনের শুচিতা বজায় রাখছে।'

'রাখছে।' তপতী উত্তর করেছে, 'আর এদিকে চৈত্র-হাওয়ার দাপাদাপি, হাওয়ায় ছড়ানো কোকিলের কূজন, চাঁপার গন্ধ !'

'কিন্তু রুনি যে টলছে না নড়ছে না !' গম্ভীর হয়ে জয়তী বলেছে, 'হাওয়া বাড়াবাড়ি করছে, বুকের বসন সরাতে চাইছে, টের পেলে রুনি হাওয়াকে ধমকায় চোখ রাঙায়। কোকিলটা বেশী জ্বালাতন করছে। টের পেলে ঘরের জানলা বন্ধ করে দেয়।'

'দেয় !' তপতী বেহায়ার মত হেসেছে, 'কিন্তু ক'দিন, কত সময় ? কতক্ষণ ও দরজা-জানলা বন্ধ রেখে দেওয়ালে টাঙানো স্বামীর ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে ধ্যান করে কাটাতে পারে ?'

'তারপর তুই কি করবি শুনি ?' জয়তী বলেছিল, 'তারপর তোর রুনিকে কোন্‌দিকে নিয়ে যাবার মতলব !'

'ছোট ভাইকে পড়াতে এল একটি ছেলে। মাস্টার। ছেলেটি দেখতে ভারি সুন্দর। রুনিদের বাড়িতে থেকে গেল।'

'তারপর ?' জয়তী তপতীর চোখ দেখছিল।

দিদির চোখ এড়িয়ে তপতী তার কলমের নিব দেখে। তারপর একসময় একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে ফিক্ করে হাসে।

'ছেলেটি কবিতা লিখতে পারত।'

যেন চমকে উঠতে গিয়েও সামলে নেয় জয়তী, তপতীর মত ফিক্ করে হাসে।

'কবিতা লিখত ! তাই বল। আর সেই কবিতা পড়ে বুঝি রুনি মাস্টারের প্রেমে পড়ে গেল ?'

'কবিতা পড়ে প্রেমে পড়ে গেল।' মৃদু গলায় তপতী হাসল। বিদ্রূপের হাসি। হাসিটা জয়তীর বুকের ভিতর তিরতির করতে থাকে।

ঠোঁট বেঁকিয়ে তপতী দিদিকে দেখে। তারপর : 'নায়কের কবিতা পড়ে, আঁকা ছবি দেখে, বাঁশী শুনে সেকালে মেয়েরা প্রেমে পড়েছে কিনা জানি নে, এ-যুগের রুনিরা পড়ে না।'

'তবে ?' জয়তী ঢোক গিলল। 'শেষ পর্যন্ত তোর কী বলার ইচ্ছে ?'

'মাস্টার রোজ বিকেলে বাড়ির ছাদে উঠে খালি গায়ে একটু ডন বৈঠক করত। খোলা হাওয়ার জন্যে রুনিও ছাদে গেছে।'

'তারপর ?'

'তারপর আর কি, মাস্টার তার কবিতার খাতাটা রুনির সামনে ফেলে দিয়ে বলত—তুমি পড়, পড়ে দেখ কেমন হয়েছে। দুপুরে নতুন একটা কবিতা লিখে ফেলেছি।'

'রুনি কবিতা বুঝত না ?' জয়তী ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করেছে।

'বুঝত কিনা জানি নে, তবে কবিতার খাতা নিয়ে ঘটা করে কার্নিশের পাশে ও ঘন হয়ে বসেছে। শেষবেলার পাকা সোনা-রঙের রোদ তখন ছাদের ওধারের সুপুরীগাছের মাথায় জ্বলছে। সুপুরীর ফুল এসেছে। চড়া মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে বিকেলী হাওয়ায়। মাস্টার নিজের মনে ডন করছে, করতে করতে হঠাৎ একসময় ওদিকে চোখ ফেরায়।'

'ওদিকে মানে রুনির দিকে ? খাতা খুলে এক মনে কবিতা পড়ছিল মেয়ে ?'

'ছাই পড়ছিল। খাতা বন্ধ করে পাশে সরিয়ে রেখে হাঁ করে ও ছেলেটিকে দেখছিল, দেখছিল একুশ বছরের যুবকের উদ্ধত বুকের পেশী, বলদৃপ্ত বাহু, সুঠাম সুগৌর—'

'কিছু বলেছিল কি ছেলেটি মেয়েটিকে, এভাবে তাকিয়ে তাকে দেখছিল বলে ?' জয়তী ভুরু কুঁচকোয়।

তপতী ঘাড় কাত করে।

'রুনি উত্তর করল, কবিতা পড়ছি না, দেখছি,—তোমার শরীরের কবিতা, পেশীর ছন্দ, রক্তের—'

জয়তী বাধা দেয়।

'এসব বলবে রুনি ? রুনির মুখ দিয়ে এসব কথা বলাতে চাস।'

'তবে কি।' তপতী থুতনী নাড়ল। 'শুধু এই? রুনি তখনি উঠে দাঁড়াবে, ছুটে যাবে মাস্টারের কাছে, গিয়ে বলবে, কবিতা শুধু পড়ে তৃপ্তি নেই, দেখে তৃপ্তি নেই, আমাকে ছুঁতে দাও, আমার শরীর দিয়ে অনুভব করতে দাও শরীরের ছন্দ, রক্তের দোলা—'

'দেহবাদ। নির্জলা দেহবাদ।' তপতী বলে শেষ করার আগে জয়তী বলেছিল, 'ভীষণ নিন্দা হবে তোর গল্পের। কাল সাহিত্যের আসরে যদি এরকম একটা গল্প পড়িস তো—'

দিদিকে শেষ করতে না দিয়ে তপতী বলেছিল, 'তা তো হবেই নিন্দে—ব্যোমকেশ-প্রভুদয়ালের দল হয়তো আসর ছেড়ে উঠে যাবে—কিন্তু তাই বলে কি আমি সত্যকথা বলব না—রুনি যদি কেবল মগজের মধ্যে প্রেমকে ধরে রেখে, কেবল কবিতার হাওয়া বুকে পুরে তৃপ্ত না থাকে, সে কি আমার দোষ! আর থাকবেই বা কেন।'

জয়তী আর কিছু বলে নি। শুয়ে পড়েছে। টেবিলের ওপর নুয়ে পড়ে তপতী গল্পের বাকিটুকু শেষ করেছে। সত্যি কি ও সেভাবে গল্পটা শেষ করল? জয়তী তখন ভাবছিল। সকালে তপতী তাই বলল না? ভাবতে ভাবতে কান খাড়া করে ধরল ও। আর একটা গাড়ি লনে ঢুকল।

॥ চার ॥

'যুগসন্ধি' কাগজের সম্পাদক ভূমেন্দ্রনারায়ণ। লম্বা সরু চেহারার মানুষ। ধনেশ-পাখির ঠোঁটের মতন বাঁকা উঁচু প্রকাণ্ড একখানা নাক। যেন এই উঁচু নাক দিয়ে ভূমেন্দ্রনারায়ণ হাজার হাজার মাইল দূরের সমাজের কোন্ তলার মানুষের কী গলদ, কোন্ রাজ্যের ক্ষমতাসীন রাজনীতিক দলের কী ত্রুটি, কোন্ দেশের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল কূটনীতির কালো চশমা পরে আর এক দেশে বেড়াতে এল, টের পান। অহরহ টের পান, আর সকলের আগে কাগজে সে-সব প্রকাশ করে এ-দেশের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, শিক্ষিত জন-মানসের উপর আলোকসম্পাত করেন। গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে, গলায় জড়ানো সিল্কের চাদর। কেউ লক্ষ্য করলে দেখবে ভূমেন্দ্রনারায়ণের বুকপকেটে দুটি পাতা সহ একটি গোলাপ কুঁড়ি মাথা জাগিয়ে আছে। শুকিয়ে গেছে যদিও পাতা কুঁড়ি, তার মানে সচ্চিদানন্দবাবুর বাড়ির সাহিত্য-মজলিশে আসার আগে, পথে তিনি আর একটা অনুষ্ঠান সেরে এসেছেন। সেটাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। চৌরঙ্গিতে একটা আর্ট এগজিবিশন হচ্ছে। ভূমেন্দ্রনারায়ণকে ডাকা হয়েছিল এগজিবিশন 'ওপেন' করতে। সেখানে ফুলের তোড়া রাখা হয়েছিল তাঁর সামনে। তাই থেকে শুধু একটা গোলাপকুঁড়ি তুলে তিনি পকেটে পুরেছেন। বস্তুত স্বাধীন হয়ে দেশের মানুষ আর কিছু না করুক, সংস্কৃতি নিয়ে বড় বেশী মাথা ঘামাচ্ছে। চারদিকে অনুষ্ঠানের ছড়াছড়ি। শিল্প সঙ্গীত নৃত্য নাটক সাহিত্য—একটা না, কম করেও শহরের দশ জায়গায় দশটা করে অনুষ্ঠান হচ্ছে; আর সে-সব জায়গায় উদ্বোধক হয়ে, সভাপতি হয়ে, প্রধান অতিথি হয়ে ভূমেন্দ্রনারায়ণকে উপস্থিত থাকতে হচ্ছে। আজ সন্ধ্যার পর

সচ্চিদানন্দবাবুর বাড়ির অনুষ্ঠান শেষ করে তাঁকে আবার ছুটতে হবে পাতিপুকুর। সেখানে একাঙ্ক-নাটক প্রতিযোগিতা হচ্ছে। ভূমেন্দ্রকে সেই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে হবে। এই নিয়ে গাড়িতে ব্যোমকেশ গাঙ্গুলীর সঙ্গে তাঁর কথা হচ্ছিল। চৌরঙ্গির এগজিবিশনে ঔপন্যাসিক ব্যোমকেশও উপস্থিত ছিলেন। গাড়িতে বসে দুজন সংস্কৃতি নিয়ে কথা বলছিলেন না। বলছিলেন হয়রানির কথা। বলছিলেন ব্লাডপ্রেসারের কথা। ভূমেন্দ্রর 'লো' ব্যোমকেশের 'হাই'। ভূমেন্দ্র বলছিলেন, 'আর পারা যায় না। এদের ধারণা, 'যুগসন্ধির' এডিটার ফাংশানে উপস্থিত না থাকলে কাগজে খবরটা ছাপা হবে না। এদের ধারণা, 'যুগসন্ধির' সম্পাদক বুঝি কেবল দেশের দুর্নীতি—সমাজের ক্ষত-ঘা দুর্গন্ধ সব হাঁটকে বেড়ায়, আর কাগজে সেগুলো ফলাও করে ছাপায়, সুতরাং ডাকো সম্পাদককে—এসে স্বচক্ষে দেখে যাক আমরা কত ভালো ভালো জিনিস নিয়ে আছি, আমরা কত সভ্য সংস্কৃত হয়ে গেছি।' কথা শেষ হলে ব্যোমকেশ হেসেছেন ঃ 'আমার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না আজ ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ির সাহিত্যেব আসরে আসার। কিন্তু এড়াতে পারলাম কী ? কলেজে লিলির সঙ্গে পড়ে সচ্চিদানন্দবাবুর মেয়ে। বাবা, তোমাকে পার্ক স্ট্রীটের সাহিত্য-বাসরে সভাপতিত্ব করতেই হবে---তপতী গল্প পড়বে। এখানে তোমার "না" চলবে না।'

'মুশকিল!' ভূমেন্দ্রনারায়ণ বিড়বিড় করে বললেন, 'পাতিপুকুরের ওটা আমি রিফিউজ করতাম। কিন্তু পাবলাম না। সেখানে উপানন্দর ছেলেমেয়েরাও নাকি আছে শুনলাম।'

'ও, উপানন্দ তো তোমাদের একজন ডিরেক্টর---তা তার ছেলে-মেয়ে যেখানে আছে সেখানে তোমার আর "না" বলা চলে কি করে। তা এটা, মানে সচ্চিদানন্দবাবুর এটা পারলে না এড়াতে ? বললে না কেন আমি প্রেসারের রুগী।'

'বলেছি, কিন্তু শোনে কে। কাল রাত্রে সচ্চিদানন্দবাবুর স্ত্রী বিভা বাড়ি গিয়ে হাজির। বললে, না আপনাকে বেশিক্ষণ ধরে রাখব না। আপনাকে উপস্থিত থাকতেই হবে। আমার বাড়ির, আমার নিজের ঘরের ব্যাপার। আপনি না থাকলে আমার মেয়ের গল্প-পড়া অসম্পূর্ণ থাকবে। বক্তৃতা করতে হবে না আপনাকে, শুধু যাবেন আর তপতীর গল্পটি শুনে একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে চলে আসবেন—'

'হা হা!' ব্যোমকেশ উচ্চ শব্দ করে হেসেছেন। 'তার মানে আমার বাড়ির গ্রীষ্ম-বাসরের খবরটি কাল ফলাও করে আপনার কাগজে ছাপবেন, আমার মেয়ের সাহিত্য-প্রতিভা নিয়ে দরকার হলে একটা সম্পাদকীয় কলাম লিখে দেবেন 'যুগসন্ধি' দৈনিকে।' একটু থেমে পরে ব্যোমকেশ বললেন, 'তা বিভাবতীকে বললে না কেন, আমার ডায়বেটিজ, মিষ্টি মোটে চলবে না।'

'ডায়বেটিজ!' ভূমেন্দ্রনারায়ণ চমকে ওঠেন। 'আমার তো ব্লাডপ্রেসার, লো-প্রেসার,—এই মাত্তর তোমার সঙ্গে কী কথা হল, তোমার হাই-প্রেসার।'

'সরি, আমার ভুল হয়েছে।' ঈষৎ লজ্জিত ও অপ্রতিভ হয়ে ব্যোমকেশ চুপ করে যান। চোখ বুজে একটু কি ভেবে নিয়ে পরে ভূমেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে হাসেন: 'ও হ্যাঁ, জাস্টিস রাধারমণের ডায়বেটিজ। আর্ট এগজিবিশনে তাঁর সঙ্গে দেখা হল না? বলছিলেন তাঁর নাকি সুগার ভয়ংকর বেড়ে গেছে।'

'তাই বল।' ভূমেন্দ্রনারায়ণ মোটেই খুশী হন না। 'কারটা কার ঘাড়ে এনে ফেলছ।'—বিড়বিড় করে বলেন আর গাড়ির বাইরে চোখ রেখে চিন্তা করেন এমন কম মেমারি ও এত মোটা মাথা নিয়ে ব্যোমকেশ এতবড় সাহিত্যিক হল কি করে। অবশ্য ভূমেন্দ্রনারায়ণ যদিও ব্যোমকেশের বহুকালের বন্ধু, আজ পর্যন্ত তার লেখা একটা বইয়ের একটা লাইনও পড়ে দেখেন নি। বলতে কি, ব্যোমকেশের বিদ্যাবুদ্ধির ওপর ভূমেন্দ্রর আস্থা নেই। মোটামোটা

কতকগুলি উপন্যাস ছেড়েছে বাজারে আর এই নিয়ে লোক হৈ-চৈ করছে। বাংলাদেশের পাঠকের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় 'যুগসন্ধির' সম্পাদকের অজানা নেই। ব্যোমকেশের মোটা মাথা বলতে ভূমেন্দ্র তার মোটা বুদ্ধিকেই বোঝেন। না হলে ব্যোমকেশ গাঙ্গুলীর পাহাড়ের মত দেহের তুলনায় মাথাটা বেশ ছোট। চোখ দুটো আরও ছোট। সাপের চোখের মত কুৎকুতে একজোড়া চোখ, ছোট মাথা আর পর্বতের মত বিপুল শরীর—ব্যোমকেশের মধ্যে প্রতিভা কোথায় আছে ভূমেন্দ্র জানেন না। হাজার-দেড়হাজার পৃষ্ঠার উপন্যাস লিখতে পারে লোকটা, কিন্তু যাকে বলে ইন্টেলেক্-চুয়াল—মননশীল কোনও লেখা ওই মানুষের মাথা থেকে বেরোতে পারে ভূমেন্দ্র বিশ্বাস করেন না। বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য কতকগুলো ঘটনা জড়ো করে আজেবাজে সব চরিত্র সাজিয়ে মোটা আঁচড়ের কাহিনী রচনা করা যে কত সহজ এবং বাংলাদেশের অবোধ পাঠকদের সামনে সে-সব ফেলে দিলে তারা যে গোগ্রাসে গিলবে ভূমেন্দ্রর জানা আছে। অশিক্ষিত দেশ। এই দেশের পনেরো আনা মানুষ চাইছে চিপ্ সেন্টিমেন্ট। সস্তা ভাবপ্রবণতা। 'যুগসন্ধি' কাগজই তার বড় প্রমাণ। প্ল্যানিং কমিশনের রিপোর্ট, ফরেন এক্সচেঞ্জ বা গভর্ণমেন্টের ইম্পোর্ট-পলিসি নিয়ে যেদিন কাগজে প্রবন্ধ বেরোয় সেদিন, আর যেদিন বন্যা দুর্ভিক্ষ কি আন্দামান বা দণ্ডকারণ্য নিয়ে সরকারের নীতির সমালোচনা করে লম্বা-চওড়া সেন্টিমেন্টাল ধরনের আলোচনা হয় সেদিনের কাগজের বিক্রির রকমফের থেকে বোঝা যায়—বোঝা গেছে বাংলাদেশ কি চাইছে। তেমনি ব্যোমকেশ। সেন্টিমেন্ট দিয়ে বাজী মাৎ করছে। না হলে উপন্যাস লিখে এই গরীব দেশে গাড়ি-বাড়ি? ব্যোমকেশের কোনও লেখায় বুদ্ধির ছিঁটেফোটা নেই। ব্রেন-ওয়ার্ক না ছাই! কায়িক শ্রম, কেবল কলম চালিয়ে যাওয়া। আর এটা তো জানা কথা, মেডিকেল সায়ান্স তাই বলে। যে লোককে সদাসর্বদা ব্রেন্-ওয়ার্ক মানে মগজ

নিয়ে কাজ-কারবার করতে হয় সেই লোক গায়ে-গতরে এমন দিন দিন ফুলতে পারে না। সে রোগা শুকনো চেহারার মানুষই হবে—রোজ এতটা করে ফস্‌ফরাস তার শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে। আর ব্যোমকেশ? ভূমেন্দ্রনারায়ণ মানুষটাকে মনে মনে করুণা করেন। আরও দু একটা সভা-সমিতিতে ব্যোমকেশকে তিনি বক্তৃতা করতে শুনেছেন। না, ব্যোমকেশ যে কী, কতটা তার দৌড়—আজ না, পঁচিশ বছর আগে ভূমেন্দ্র তা জেনে রেখেছেন। আজকের মত আটপাতার দৈনিক ছিল না 'যুগসন্ধি'। সেদিন হরমোহন দত্ত স্ট্রীটের একটা অন্ধকার একতলা বাড়ি থেকে ছপয়সা দামের চিল্‌তে সাপ্তাহিক হয়ে 'যুগসন্ধি' বেরোত। তখন থেকে ব্যোমকেশের সঙ্গে ভূমেন্দ্রর পরিচয়। পাঁচ টাকা, চার টাকা, তিন টাকায় পর্যন্ত ব্যোমকেশ তাঁর সাপ্তাহিকে গল্প দিয়েছে। এখন নাকি একটা গল্পের জন্য একশো টাকা হাঁকে সে। তা হাঁকুক। কথা সেটা নয়। সেবার 'যুগসন্ধির' (তখন ডেইলি হয়ে গেছে) একটা সাহিত্য-স্পেশ্যালের জন্য ভূমেন্দ্র চিঠি দিয়ে লোক পাঠিয়েছিলেন ব্যোমকেশের কাছে লেখার জন্যে। চিঠিতে ভূমেন্দ্রর সই ছিল। তা সত্ত্বেও ব্যোমকেশ ভূমেন্দ্রর পিওনকে সব কথার আগে বলে বসল, 'টাকা এনেছ, তোমার বাবু কি টাকা দিয়ে পাঠিয়েছেন?' ফিরে এসে পিওন যখন এ-কথা বলল তখনই অবশ্য একশো টাকার একখানা নোট দিয়ে ভূমেন্দ্র তাকে আবার ব্যোমকেশের বাড়ি পাঠিয়ে দেন। এবং সেদিনই ভূমেন্দ্র বুঝেছেন ব্যোমকেশের আসল রূপটা কী। তাই হয়, ভূমেন্দ্র পরে চিন্তা করেছেন, মানুষ যখন মানি-মাইণ্ডেড হয়ে যায়, তখন তার ভদ্রতা সৌজন্যতাবোধ বন্ধুত্ব সব চুলোয় যায়। ব্যোমকেশের আজ তাই হয়েছে। কেন, টাকা তো ভূমেন্দ্রনারায়ণও করেছেন। কিন্তু তিনি কি তাঁর কোনও পুরনো বন্ধুর সঙ্গে··· পরে একদিন ভূমেন্দ্রর সঙ্গে একটা মিটিং-এ দেখা হতে ব্যোমকেশ হেসে বলেছিল, 'আরে, তুমি যে সত্যি-সত্যি তখনই একেবারে টাকা

দিয়ে পিওনটাকে পাঠালে! আমি ঠাট্টা করেছিলাম, আমি বেচারার চেহারাটা দেখেছিলাম যে—হা-হা।' গম্ভীর থেকে ভূমেন্দ্র উত্তর করেছিলেন, 'না, টাকা তো তোমাকে এমনিও দিতে হত। হাতে ছিল তাই সেদিনই পাঠিয়ে দিলাম।' বোকা ব্যোমকেশ তাই জেনে নিয়েছে। আসলে কি ও বোকা! আর একটা চাল। ধূর্ত লোকে যা সচরাচর করে। মোটের ওপর ভূমেন্দ্র ব্যোমকেশকে মনে মনে ঘৃণা করেন। অবশ্য তিনি সেটা বুঝতে দেন না। দেখা হলে হাসেন, কুশলবার্তাও জিজ্ঞেস করেন। ওপরে সবই ঠিক আছে। বুদ্ধিমান মানুষের এভাবে চলা ছাড়া উপায় কি?

এদিকে ব্যোমকেশও গাড়ির আর এক জানলায় চোখ রেখে ভূমেন্দ্রনারায়ণকে বিশ্লেষণ করেন। ডায়বেটিজ বলতে হঠাৎ ও এতটা গম্ভীর হয়ে যাবে ব্যোমকেশ আশা করেন নি। তার অর্থ লোকটার হিউমার-বোধ কম। চিরকালই কম। কেমন কাঠখোট্টা নীরস প্রকৃতির মানুষ ভূমেন্দ্র সেই ছেলেবেলা থেকে। হতেই হবে। ব্যোমকেশের মতন তো ভূমেন্দ্র আর সৃজনীশিল্প নিয়ে মেতে নেই। সে চেনে ব্যবসা-বানিজ্য, টাকা-পয়সা। চেনে নিজের স্বার্থ। ভূমেন্দ্রর বেনিয়া-মনকে ব্যোমকেশ আগেও ঘৃণা করতেন এখনও করেন। চোখের ওপর তো দেখলেন লোকটা পয়সার জন্য কী-না করেছে। এই 'যুগসন্ধি' পত্রিকা তার প্রমাণ। একবার সাপ্তাহিক হল, একবার পাক্ষিক হল—'যুগসন্ধি' পুরোপুরি কমার্শিয়াল কাগজ হয়ে দিনকতক বেরোয়, তারপর হয়ে যায় সাহিত্য-পত্র, তারপর দিনকতক একেবারে ভোলভাল পাল্টে সিনেমা আর মঞ্চের খবরে ভর্তি হয়ে আর সুন্দর সুন্দর মেয়ের মুখ ছেপে 'যুগসন্ধির' বছর দুই কাটে। দৈনিক হবার পর থেকে অবশ্য ভূমেন্দ্র পলিটিক্স নিয়ে আছে। কিন্তু 'যুগসন্ধির' পলিটিক্স কতবার ডাইনে কতবার বাঁয়ে ঝুঁকেছে, তার হিসাব যদি কেউ রেখে থাকে তো কাগজের কর্ণধার ভূমেন্দ্রই রেখেছে। আর কারুর দায় নেই এই হিসাব রাখার।

কেন না প্রত্যেক মানুষই একটা নীতি একটা আদর্শ সামনে রেখে চলে। ভূমেন্দ্রনারায়ণ তা রাখতে গ্রাহ্য করে না। তার লক্ষ্য শুধু পয়সা (অবশ্য পয়সার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠার চিন্তাও আসে এবং সেদিক থেকেও ভূমেন্দ্র করতে না পারে এমন কাজ নেই)। স্বার্থান্বেষীরা চিরকাল যা করে এসেছে। না, নীরস বললে ভুল করা হবে, ব্যোমকেশ চিন্তা করেন, ভূমেন্দ্রনারায়ণ প্রাণহীন। একটা যন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্রযুগের ব্যর্থতা যদি কেউ প্রমাণ করতে চায় তো আঙুল দিয়ে ভূমেন্দ্রকে দেখিয়ে দিলে পারে। আশ্চর্য, ব্যোমকেশ ভেবে অবাক হন, চৌরঙ্গির এগজিবিশনে হাজারটা লোক তাঁকে প্রশ্ন করেছে, এখন তিনি কি লিখছেন, তাঁর 'স্বর্গের ওপরে' উপন্যাসকে শুধু 'ভবতারিণী' পদক দিয়ে কর্তৃপক্ষ অবিচার করেছেন, তাঁর 'সিন্ধু-সীমা'-র দ্বিতীয় খণ্ড কবে বেরোবে, ইত্যাদি —আর ভূমেন্দ্র কিনা আগাগোড়া নীরব রয়েছে! তাই হয়। ব্যোমকেশ মনে মনে হাসেন। বাতির নিচেটা অন্ধকার থাকে। যেহেতু তাঁর সঙ্গে ভূমেন্দ্রর ঘনিষ্ঠতা বেশী, বাবার গাড়ি নিয়ে লিলি এগজিবিশন থেকে কেটে পড়তে যেহেতু ব্যোমকেশ ভূমেন্দ্রের গাড়িতে চাপেন, সেই কারণে ভূমেন্দ্র তাঁর সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী নীরব কেবল না—ব্যোমকেশ বলবেন অজ্ঞ। ভূমেন্দ্র যে তাঁর একখানাও বই পড়ে নি ব্যোমকেশ সে সম্পর্কে নিশ্চিত। সময় হয় না বললে ভুল করা হবে—ব্যোমকেশ গাঙ্গুলীর উপন্যাস 'যুগসন্ধি'র এডিটার বোঝে না। শুনলে লোকে বিশ্বাস করবে? করুক না-করুক ব্যোমকেশ তা কাউকে বলতে যাচ্ছেন না। তিনি শুধু মনে মনে করুণাই করতে পারেন এ-যুগের একটা প্রথম শ্রেণীর দৈনিক সংবাদপত্রের বিখ্যাত সম্পাদককে।

'এসে গেলাম নাকি হে?' ব্যোমকেশ চুরুটটা মুখ থেকে নামান। ভূমেন্দ্রনারায়ণ ঘাড় ফেরান। 'মনে হয়।' সংক্ষেপে বলেন।

দুজনেরই চুল পাকতে আরম্ভ করেছে। বাংলাদেশের দুই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। একজন 'সভাপতি', আর একজন 'প্রধান অতিথি' আজকের সাহিত্য-বাসরের। গেট পার হয়ে গাড়ি সচ্চিদানন্দবাবুর প্রকাণ্ড লনে ঢুকতে সকলে ব্যস্ত হয়ে সিঁড়ি-বারান্দা থেকে নেমে আসেন। সকলের আগে বাড়ির কর্তা সচ্চিদানন্দবাবু, সচ্চিদানন্দবাবুর পিছনে তাঁর রূপসী গৃহিণী বিভাবতী। বিভাবতীর পাশে 'মহিলা-প্রতিভা' কাগজের সম্পাদিকা হেমপ্রভা, হেমপ্রভার ঠিক পিছনে ডক্টর নাগের স্ত্রী চামেলী। এবং তাঁদের থেকে পৌণে একহাত দূরত্ব বজায় রেখে গাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়ান কবি প্রভুদয়াল, ঔপন্যাসিক নীলাদ্রি, ঔপন্যাসিক অনাদি সাহা ও মোহিত মণ্ডল, পাবলিশার পিনাকী সোম, বিপ্লবী কবি রাধেশ ব্যানার্জি এবং আরও যেন কে কে। ব্যোমকেশ সকলকে চেনেন না। কিন্তু তাতে কি। তাঁকে সকলেই চেনে। সকলেই হাত তুলে অভিবাদন করল। ব্যোমকেশ মাথা নেড়ে প্রত্যভিবাদন জানান। অপেক্ষাকৃত বয়স কম বলে নীলাদ্রি, অনাদি ও রাধেশ পা ছুঁয়ে ঔপন্যাসিককে প্রণাম করল। নীলাদ্রি এবং অনাদিকে ব্যোমকেশ অত্যন্ত ভালবাসেন। নীলাদ্রির 'সবুজ-তারা' উপন্যাসখানা ব্যোমকেশকে উৎসর্গ করা হয়েছে। যদিও নীলাদ্রির লেখার চেয়ে অনাদির লেখার ওপর ব্যোমকেশের আস্থা বেশী, তবু নীলাদ্রিকে তিনি ভালবাসেন তার বিনীত ও মার্জিত স্বভাবের জন্যে। 'সবুজ-তারা' পড়ে তিনি অবশ্য প্রশংসা করে নীলাদ্রিকে চিঠি দিয়েছিলেন এবং তাঁর হাতের লেখা সেই প্রশংসাপত্রের ব্লক-সমেত এখন দশটা কাগজে নীলাদ্রির বইয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে। এটা নীলাদ্রির মাথায় আসে নি, এসেছে তার ধুরন্ধর পাবলিশার পিনাকীর মাথায়। পিনাকীর সঙ্গে চোখাচোখি হতে ব্যোমকেশ মৃদু হাসেন। তাঁর পুরনো পাবলিশার। এবং পিনাকীও এই নিয়ে এখন গর্ব করে বেড়ায়ঃ

'যেদিন ব্যোমকেশ গাঙ্গুলীকে কেউ চিনত না, সেদিন আমিই সাহস করে প্রথম তার উপন্যাস ছাপি। আমিই—' অবশ্য পিনাকীর 'আবিষ্কার' কথাটায় ব্যোমকেশ আপত্তি করেন। কেন না সত্যিকারের প্রতিভাকে আবিষ্কার করার দরকার হয় না। সূর্যকে কেউ আবিষ্কার করে? সে নিজেই নিজের পরিচয়। বয়োজ্যেষ্ঠ কবি প্রভুদয়াল বসু-মল্লিক যখন ব্যোমকেশের দু'হাত চেপে ধরে 'অনেক-দিন পর দেখা' বলে আবেগে উচ্ছ্বাসে প্রায় নেচে উঠছিলেন তখন—ঠিক তখনই হঠাৎ দৃশ্যটা ব্যোমকেশের চোখে পড়ল। অত্যন্ত বিসদৃশ বড় অপ্রীতিকর দৃশ্য। এখানে উপস্থিত প্রায় সবাই যখন ব্যোমকেশের সঙ্গে কথা বলতে, বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের দুটো কথা শুনতে উৎসুক লালায়িত তখন কিনা গৃহকর্ত্রী সচ্চিদানন্দবাবুর স্ত্রী 'যুগসন্ধির' সম্পাদক ভূমেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে কেবল কথায় মেতে নেই—আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভূমেন্দ্রের একটা হাত চেপে ধরেছেন: 'উঃ, আমার কেবলই ভয় হচ্ছিল আপনাকে মিস্ করব, সবাই আসবেন কিন্তু আপনাকে হয়তো পাব না—আমার যে কী ভালো লাগছে, আমি যে কত খুশী হয়েছি আপনাকে পেয়ে—' এবং কথাগুলি খুব যে একটা আস্তে বললেন তিনি তা-ও না। ব্যোমকেশের সঙ্গে একটা সাধারণ নমস্কার বিনিময় সেরেই বিভাবতী ভূমেন্দ্রকে নিয়ে পড়েছেন। যেন হাতে স্বর্গ পেলেন সচ্চিদানন্দ-গৃহিণী। যেন সাহিত্য-বাসরে একটা দৈনিক কাগজের সম্পাদকই সব—ঔপন্যাসিক ও কবিরা এলেন ভালো, না এলেও কিছু যায় আসে না। ব্যোমকেশ মনে মনে হাসলেন। প্রচার! প্রচার! প্রচারের মোহ দেশটাকে—পৃথিবীটাকে ছেয়ে ফেলেছে। আমার নাম কাগজে ছাপা হোক, আমার স্বামীর নাম কাগজে ছাপা হোক, আমার মেয়ের নাম কাগজে ছাপা হোক। কিন্তু তাই কি সব। প্রভুদয়াল বসু-মল্লিক, অনাদি, নীলাদ্রি ইত্যাদি পরিবৃত হয়ে ব্যোমকেশ যখন সচ্চিদানন্দবাবুর সঙ্গে তাঁর হল্-কামরার দিকে

অগ্রসর হন, তখন ভুরু-জোড়া কুঁচকে তিনি আর একটা কথা চিন্তা করেন। তাঁর মনে পড়ে যায় তখন গাড়িতে বসে ভূমেন্দ্র কথাটা বলছিল। কাল রাত্রে বিভা ছুটে গেছেন এডিটারের বাড়ি। অথচ ব্যোমকেশকে নিমন্ত্রণ করতে গেলেন সচ্চিদানন্দবাবু একলা। এখানে কি—এই ব্যাপারে কি—ঔপন্যাসিকের বিশ্লেষণী মন বিভা-চরিত্র বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করে, বিশেষ এখন, দুজন সকলের পিছনে হাত ধরাধরি করে হাঁটছে, অন্তরঙ্গ গলায় কথা বলছে দেখে। এ থেকে তুমি কোন্ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পার? ব্যোমকেশ নিজেকে জিজ্ঞেস করেন, এবং একটি স্ত্রীকে বিশ্লেষণ করতে গেলে একটি স্বামীকেও সেই সঙ্গে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয়। চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যোমকেশের তীক্ষ্ণদৃষ্টি গৃহস্বামী গ্লাসগো-ফেরত বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার সচ্চিদানন্দ গুপ্তর উপর পতিত হল। মেদবহুল শরীর—কিন্তু খর্বাকৃতি। দেহের অনুপাতে মাথাটা বড়, কিন্তু বিরলকেশ—প্রায় টাক পড়ার মত অবস্থা। রঙ ময়লা। সচ্চিদানন্দবাবুর তুলনায় বিভাবতী রূপসী সন্দেহ নেই, বয়সও বেশ কিছু কম মনে হয়। সচ্চিদানন্দবাবুকে প্রৌঢ় বলা চলে, আর বিভা এখনও সরকারীভাবে প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছেন জোর গলায় বলা চলে না। ব্যোমকেশ একটা ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং চোখ ঘুরিয়ে নিমেষের জন্য 'যুগসন্ধির' সম্পাদককেও দেখে নিলেন। নতুন করে অবশ্য ভূমেন্দ্রকে দেখার দরকার হত না কিন্তু এখন হল। রোগা লম্বা শাখাপত্রহীন একটা এরণ্ড গাছ। মাথার চুল চৌদ্দ আনা সাদা হয়ে গেছে। যদিও কলপ ব্যবহারে কার্পণ্য নেই। কিন্তু তাতে কি আর চুলের স্বাভাবিক রঙ ফেরে! অতিরিক্ত কলপ ব্যবহারে মেস্তাপাটের বর্ণ ধরেছে। থাকার মধ্যে আছে ধনেশপাখির ঠোঁটের আকৃতির একটা সাংঘাতিক বড় নাক। ভূমেন্দ্রনারায়ণ মানে তার নাক। কানের নিচে দুটো পাথুরে চোয়াল ছাড়া মুখাবয়ব বলতে আর কিছু চোখে পড়ে না। গাল দুটো খাড়া গর্ত

হয়ে কোথায় যে নেমে গেছে, হারিয়ে গেছে তার ঠিক নেই। কেবল নিচের দিকে—যেন কোন্ অতল গহ্বর থেকে মাথা জাগিয়ে থাকা একটুখানি থুতনীর রেখা মনে করিয়ে দিচ্ছে এটাও একটা মনুষ্যমুখ।

সুসজ্জিত হল্ঘরের বিস্তৃত ফরাসের ওপর বসতে বসতে ব্যোমকেশ চিন্তা করেন। চিন্তা করেন কিন্তু কোনও সদুত্তর পান না। প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে যায়। না হলে, ব্যোমকেশ ভাবেন, বেঁটে মেদালো সচ্চিদানন্দবাবুকে দেখলে একটা দশবছরের ছেলেও বলবে, শীর্ণ বিবর্ণ এড়ণ্ডগাছতুল্য ভূমেন্দ্রনারায়ণের চেয়ে তাঁর দৈহিক শক্তি অনেক বেশি। কিন্তু—

হল্-কামরার পশ্চিমের দরজা-জানলার বাইরে বৈশাখের বেলাশেষের রোদ ছুটো আতাগাছের ছড়ানো ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে তপ্ত সোনার রঙ ধরে ঝকমক করছে। রোদ্রের উজ্জ্বল রেখা ওদিকের করিডরে এসে পড়েছে। ব্যোমকেশ চোখ ফেরাতে দেখলেন সুবেশা বিভাবতী চার-পাঁচটি মেয়ের সঙ্গে হেসে কথা বলছেন। তাঁরাও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। ব্যোমকেশ চিন্তা করলেন। আধুনিক ঢঙের খোঁপা, আধুনিক সাজসজ্জা এদের সকলের। কিন্তু বিভাবতী যেন সকলকে হার মানিয়েছেন। শুধু কি চুল শাড়ি ব্লাউজ—হাসি, হাতনাড়ার চঞ্চল বেগোজ্জ্বল ভঙ্গি দিয়ে ওখানে দাঁড়ানো সকলের চেয়ে কম বয়সের অনূঢ়াটিকেও সচ্চিদানন্দ-বাবুর স্ত্রী পরাস্ত করতে চাইছেন বলে মনে হল। ব্যোমকেশ আর সেদিকে তাকান না। তাঁর মনের গভীরে একটা কথা গুপ্ত আবর্ত হয়ে অবিরত পাক খাচ্ছে। বিশেষ তাঁর পাশে বসা ভূমেন্দ্রর কথা চিন্তা করে, ভূমেন্দ্রের হাত চেপে ধরে ইঞ্জিনিয়ার-গৃহিণীর কথা-বলার ছবি মনে করে। পার্ভার্সন? রুচিবিকৃতি? অসহায় চোখে ব্যোমকেশ সচ্চিদানন্দবাবুর দিকে তাকান। যেন আরও কে কে হল্কামরায় এসে ঢুকল। সচ্চিদানন্দবাবু হাত তুলে সকলকে স্বাগত

জানাতে ব্যস্ত হয়ে গেছেন। না, ব্যোমকেশ চিন্তা করছিলেন রুচিবিকৃতি, পার্ভার্সন, এসব নিয়েও কেউ কেউ আজকাল গল্প উপন্যাস লিখছে। যৌনতা, অবক্ষয়, বিকৃত কামনার আর্তির ছবি গল্পের আকারে সাজাতে তাদের উদ্যমের উৎসাহের শেষ নেই। ব্যোমকেশ এদের ঘৃণা করেন। যতদূর মনে পড়ে তাঁর, কিছুকাল আগে তিনি বিকৃত কামনা নিয়ে একটা উপন্যাস লিখবেন ঠিক করেছিলেন, অবশ্য সে-বইয়ে তিনি ইন্দ্রিয়ের জয়গান না করে উগ্র অন্ধ ইন্দ্রিয়পরায়ণতার ভয়ংকর পরিণতির ছবি দেখাতেন, এবং মনে করে তিনি সেক্স-এর ওপর লেখা তুখানা ইংরেজী বই যোগাড় করেছিলেন, যোগাড় করেছিলেন মানে হঠাৎ একদিন কলেজ স্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে পুরনো বইয়ের দোকানে চোখে পড়ে যেতে, বই তুখানা কিনেই ফেলেছিলেন। তারপর সেই বই বাড়িতে বয়ে এনে তিনি যখন পড়তে .আরম্ভ করলেন তখন তাঁর মাথা ঘুরে গেল। তাড়াতাড়ি বই বন্ধ করে রাখলেন। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু ঘুম আসে নি। কেবল মন না, তিনি অনুভব করছিলেন শরীরের মধ্যেও যেন কত জঘন্য কামনার ক্লেদ জমতে আরম্ভ করেছে, ময়লার পোকার মতন সেই ক্লেদ থেকে লক্ষ লক্ষ জীবাণুর জন্ম হচ্ছে, আর সেগুলি তাঁর দেহের প্রত্যেকটা রোমকূপের মধ্যে ঢুকে পড়ে কিলবিল করছে। পরদিনই তিনি বই ছুটো আবার পুরনো বইয়ের দোকানে প্রায় জলের দরে বেচে দিয়ে আসেন। বাড়িতে রাখতে সাহস পান নি, কেননা যদি ছেলে মেয়েদের চোখে পড়ে তবে, এ-সব বই পড়তে পড়তে তাদের মনের কী অবস্থা হবে কল্পনা করে তিনি শিউরে উঠেছিলেন। অবশ্য তাঁর ছেলে বলতে কেউ নেই। একমাত্র সন্তান মেয়ে লিলি। তখন সবে সে স্কুলের ওপরের ক্লাসে উঠেছে। তা হলেও বাপের মতই অনুভূতিপ্রবণ মন মেয়ের এবং বুদ্ধিমতী। তার উপর সবে যৌবনের দরজায় পা দিয়েছে ও। যদি লিলির হাতে এ বই কখনও পড়ে

এবং সে তা পড়তে আরম্ভ করে তবে তার মনের উপর এর ক্রিয়া কতটা হবে, হতে পারে আশঙ্কা করে ব্যোমকেশ বই দুটো আর বাড়িতে রাখতেই সাহস পান নি। এবং ব্যোমকেশ পরে চিন্তা করেছেন এসব নিয়ে গল্প উপন্যাস লেখা উচিত না, কারণ লেখকের চরম লক্ষ্য যতই সাধু হোক পাঠক পাঠিকারা, বিশেষ করে তরুণ-মতি বালক বালিকারা গল্পটি থেকে খারাপ উপাদানগুলিই সংগ্রহ করবে, মনে রাখবে, এবং তাদের চেতন এবং অবচেতন মনের ওপর সেগুলির ক্রিয়া বিষের মত হবে। কাজে-কাজেই যে বই দশের দেশের উপকারে আসবে না, সেরকম বই লেখার সার্থকতা ব্যোমকেশ খুঁজে পান নি। তিনি মনে করেন প্রত্যেক সাহিত্যেকের চেষ্টা, ইচ্ছা ও লক্ষ্য সৎ-সাহিত্য সৃষ্টি করার দিকে নিবিষ্ট থাকবে, থাকা উচিত। যে বই বাপ ও ছেলে একসঙ্গে বসে পড়তে পারে, মা মেয়ে পড়তে পারে, বোনের হাতে বইটি তুলে দিতে ভাইয়ের কোনরকম সংকোচ থাকে না; প্রত্যেকটা ক্লাব, পাড়ার সবকটা লাইব্রেরী, স্কুল ও কলেজ যে বই রাখতে কোনরকম আপত্তি করে না, সে-বই ব্যোমকেশ গাঙ্গুলী লিখেছেন, লিখে যাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও লিখবেন। কেননা তিনি একটা কথা কিছুতেই ভুলতে পারেন না। সৎ-সাহিত্য সর্বজনগ্রাহ্য। গ্রেট ওয়ার্ক—মহৎ-সাহিত্যের প্রধান গুণ তাই। যেমন রামায়ণ মহাভারত।

হল্-কামরায় যাঁরা আসর জমিয়ে বসেছেন তাঁদের মধ্যে, কারো কারোর এর মধ্যেই ধৈর্যচ্যুতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তাঁরা ঘনঘন হাতঘড়ি দেখছেন, মাথার ওপর ঘুরন্ত পাখাগুলি দেখছেন। গ্রীষ্মকাল। কেউ কেউ প্রচুর ঘামছেন এবং রুমাল দিয়ে ঘাড় ও কপাল মার্জনা করার সময় মুখ দিয়ে অস্ফুট বিরক্তিব্যঞ্জক শব্দ বার করছেন। অতিথিদের আরাম ও স্বাস্থ্যদানের জন্য সচ্চিদানন্দবাবুর চেষ্টার ত্রুটি নেই যদিও। হলঘরের চারদিকে এতগুলি প্রশস্ত উন্মুক্ত দরজা-জানলা থাকা সত্ত্বেও তিনি দুটা সিলিং ফ্যান এবং চারটা

পেডাস্ট্যাল ফ্যান খাটিয়েছেন। তা ছাড়া দুজন চাকর প্রায় পাঁচ মিনিট অন্তর আইসক্রিম ফলের রস ও বরফ মেশানো জলের গ্লাস ভর্তি একটা বড় ট্রে নিয়ে ভেতরে ঢুকছে এবং অতিথিদের সামনে সেটা বাড়িয়ে দিচ্ছে। কেউ আইসক্রিম খান, কেউ শুধু জলের গ্লাসটি তুলে নেন। ব্যোমকেশ কোনদিনই সরবৎ টরবৎ খান না। কোনোরকম মিনারেল ওয়াটার বা গন্ধযুক্ত পানীয় তাঁর সহ্য হয় না। ক্রমাগত ঢেকুর ওঠে অথবা পেটে গ্যাস হয়। তৃষ্ণা পেলে তিনি ঠাণ্ডা জল খান। ঠাণ্ডা জলে তৃষ্ণা যত সহজে নিবারিত হয় অন্য পানীয়ে তা হয় না বলেই ব্যোমকেশের বিশ্বাস। ভূমেন্দ্র এর মধ্যে তিন গ্লাস সরবৎ খেয়েছে। একবার তো ভূমেন্দ্রর হাতে সরবতের গ্লাস তুলে দিতে বিভাবতী এগিয়ে এলেন। আসরের মধ্যে এধরনের পক্ষপাতিত্বের মধ্যে একটা অশোভনতা লজ্জা লুকিয়ে আছে চিন্তা করে বিভাবতী হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা তুলবার আগেই ভূমেন্দ্র সেটাকে ট্রে থেকে তুলে নিলে, নাকি তৃষ্ণায় অধৈর্য হয়ে তাড়াতাড়ি কাজটা নিজেই সেরে ফেলল বোঝা গেল না। দৃশ্যটা দেখে নীলাদ্রি ঠোঁট টিপে হাসছিল। ব্যোমকেশের দৃষ্টি এড়ায় নি।

॥ পাঁচ ॥

এবার কারা এলেন ? ইঞ্জিনিয়ার সারদা সোম। তাঁর স্ত্রী। তাঁর দু' মেয়ে। জাস্টিস রাধারমণ, তাঁর স্ত্রী ও পুত্রবধূ। একডালিয়া রোডের ব্যারিস্টার ভবতারণবাবু না ? হ্যাঁ, আর ভবতারণের ছেলে অরুণ। আধুনিক গল্পলেখক। বড় অশালীন বড় অশ্লীল লেখা অরুণ ব্যানার্জির। কিন্তু তা বলে সাহিত্য-বাসরে ডাকতে ক্ষতি কি। আমি তো অরুণের লেখা পড়ি না। কিন্তু, কিন্তু— মার কথায় তপতী মুখ কালো করেছিল। হ্যাঁ, পরশু দুপুরে যখন জয়তী নিমন্ত্রণ-পত্রের খামের উপর নাম-ঠিকানা লিখছিল। তপতী বলেছিল, কেবল শিল্পী ও গুণীদের ডাকা হোক। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ব্যারিস্টার জজ ডেকে কি হবে। বিভাবতী তপতীকে ধমক লাগান। 'এখানে তোমার লেখাটাই সব নয়। কেবল তাঁরা তোমার এবং তোমার চার-পাঁচটি বন্ধু-বান্ধবীর গল্প শুনবেন বা সাহিত্য আলোচনা করবেন—আর এর জন্য এত টাকা খরচ করে আমি গ্রীষ্ম-বাসর ডাকছি তা কখনও মনে ভেবো না। আমার অন্য উদ্দেশ্য আছে—আমার আরও উদ্দেশ্য আছে বড়লোক আর তাঁদের ছেলেদের ডেকে সন্দেশ ফল খাওয়ানোর।' ধমক খেয়ে তপতী চুপ করে মার ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। সচ্চিদানন্দবাবু হঠাৎ হো-হো করে হেসে ওঠেন তখন। আড়চোখে জয়তীকে দেখে পরে স্ত্রীর দিকে তাকান।

'তার মানে এখন আর নিছক সাহিত্য-প্রীতি নয়—একসঙ্গে দু' কাজ সারবার মতলব ?'

'নিশ্চয়।' মা বলছিলেন, 'তোমার কি, তুমি ব্যোমভোলা মানুষ। আমাকে সব সময় ভাবতে হচ্ছে, তপতী বড় হয়েছে, তপতীর বিয়ে—'

কেন জানি জয়তীও সে-সময় উঠে একটু বাইরে যায়।

আজ এখন জানলার বাইরে চোখ রেখে অরুণকে দেখে জয়তী খুশি হল। অরুণ নাকি বলেছিল, তপতীকে জানিয়ে দিয়েছিল, সেবার 'বসন্ত-সন্ধ্যায়' সে তার এত ভাল গল্পটা পড়ে প্রশংসা তো পায়ই নি, উল্টে প্রচুর নিন্দা শুনেছে। ব্যোমকেশ অনাদি নীলাদ্রি সাহিত্য করেন, তাঁদের কথা বলার অধিকার আছে। কিন্তু পরাশর ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার সোম কি রকম মুখ খিঁচিয়ে তার গল্পের নিন্দা করেছিল অরুণের মনে আছে: 'এসব লেখা এরকম আসরে না পড়াই উচিত—আমরা শুনব শান্তরসের সুন্দর করে লেখা গল্প কবিতা প্রবন্ধ। অশালীন অশোভনকে আমরা প্রশ্রয় দেব না— এ-ধরনের লেখা সমাজকে কলুষিত করে, সমাজদেহে—'

কাল রাত্রে তপতী মুখভার করে বলেছিল, 'হয়তো অরুণ আসবে না। আমি বলেছি যদিও পুরনোপন্থীরা তার "কুয়াশা" গল্প অপছন্দ করতে পারে, কিন্তু যাঁরা সত্যিকারের মডার্ণ, প্রগতিপন্থী তাঁরা "কুয়াশা"র খুব প্রশংসা করেছেন।'

শুনে জয়তী বলেছিল: 'নিমন্ত্রণ তো করা হয়েছে—ব্যারিস্টার ব্যানার্জি ও তাঁর ছেলে দুজনকেই তো ডাকা হয়েছে। সুতরাং অরুণ আসবে।'

'কে জানে, হয়তো আমি ওকে আলাদা করে ডাকতে সাহস পেলাম না বলে অভিমান করে না-ও আসতে পারে।'

কাটা ফলগুলো রেফ্রিজারেটরে তুলে রেখে জয়তী ঠোঁট টিপে নিজের মনে হাসল। ভাবল, অরুণ নিশ্চয় ওদের সকলের সঙ্গে এখনি হল্-কামরায় ঢুকবে না। সরাসরি তপতীর ঘরে ঢুকবে কি? মা থাকলে ঢুকবে না। জানলা দিয়ে জয়তী অরুণের সাদা পাঞ্জাবি, কোঁকড়া-চুলের ছবিটা দেখে তৃপ্ত হয়েছে। আসবে ও জানা কথা। 'ওর লেখা আমি পড়ি না।' মা-র কথা। কিন্তু তবু তো বড়লোক ব্যারিস্টারের একমাত্র ছেলে। বিশেষ করে এই পরিবারের সঙ্গে

ভবতারণবাবুর পরিবারের আজকের জানাশোনা নয়। ছোটবেলা থেকে জয়তী তপতী অরুণকে দেখছে। পার্ক স্ট্রীটের বাড়ি হবার আগে জয়ন্তীরা একডালিয়া রোডে ছিল যে। কাজেই অন্য 'উদ্দেশ্য' মনে রেখে মা যে ব্যারিস্টারের সঙ্গে তাঁর ছেলেকেও এবার গ্রীষ্ম-বাসরে ডাকবে জয়তী জানত, তপতীও জানত। কিন্তু যদি সেবারের অপমানের ভয়ে···আচ্ছা, অরুণ এবার কী নিয়ে গল্প লিখেছে? জয়তী নিজেকে প্রশ্ন করল। তপতীও বলতে পারে না। তপতীকে কাল বিকেলে কথায় কথায় জয়তী জিজ্ঞেস করেছিল। অরুণের সঙ্গে তপতীর সেদিন এস্‌প্ল্যানাডে দেখা। তপতী ছবি দেখে লাইট-হাউস থেকে বেরোবার মুখে অরুণকে দেখে। বইয়ের স্টলগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে অরুণ হাসছে। হাতে দুটো নতুন ইংরেজী বই। তারপর দুজন একসঙ্গে একটা রেস্তোরাঁয় ঢোকে। সেখানেই সব কথা হয় দুজনের। গ্রীষ্ম-বাসরে এবার ও আসছে কি আসছে না। যদি আসেও, গল্পটল্প পড়া হবে না। আবার অরুণ এ-ও নাকি বলেছিল, পড়বে, এমন গল্প সে পড়বে যে ব্যোমকেশ-পরাশরের দল সভা ছেড়ে চলে যাবে। হুঁ, তপতীর মা রাগ করবেন, বাবা রাগ করবেন, অরুণের বাবা রাগ করবেন। করুন রাগ। ওদের রাগারাগি চিরকাল থাকবে। ওদের দৃষ্টি সব সময় পিছনের দিকে। ওরা নতুন কিছু দেখলে শিউরে ওঠে, সন্দেহ করে, ভয় পায়। ওদের মুখ দেখে আমাদের লিখতে গেলে লেখা কোনদিনই এগোবে না। বাঙলাদেশে জোলো গল্প উপন্যাস ঢের লেখা হয়েছে। আজ পর্যন্ত যত লেখা হয়েছে তার মধ্যে রক্তমাংসের মানুষ তুমি পাবে না। ওরা বলে বটে 'সৎ-সাহিত্য,' কিন্তু তার মধ্যে সততা থাকলেও সাহিত্য বলে কিছুই থাকে না। শোন তপতী, অরুণ বলেছিল, মানুষ যা আছে, সাদা চোখে তুমি তাকে যেমনটি দেখছ, ঠিক তেমনটি রেখে তার স্নেহ-ভালবাসা, তার পেটের ক্ষুধা, তার হিংসা-ঈর্ষা-লোভ, তার দারিদ্র্য তার সমৃদ্ধি নিয়ে তুমি হাজারটা চিত্র আঁকতে পার, ছক

মিলিয়ে হাজারটা গল্প লিখতে পার। কিন্তু তা-ই কি সব? মানুষকে দেখতে হলে, বুঝতে হলে, তার মনের অন্ধকারে নেমে ডুবুরীর মত তোমাকে খুঁজতে হবে বুঝতে হবে সেখানে কোন্ গূঢ় রহস্যের খেলা চলছে। তোমাকে আবিষ্কারক হতে হবে। আগে আবিষ্কার তারপর শিল্প-রচনা।

বোধকরি সেদিন রেস্তোরাঁয় বসে অরুণের কথা শুনে এসে তপতী এবারের নতুন গল্পটা লিখেছে। কাল যে-গল্পের আধখানা জয়তী পড়ল এবং বাকি আধখানা ছোটবোনের মুখে শুনল। অরুণ তাকে প্রেরণা দিয়েছে। তাই হয়। একজনের প্রেরণা পেয়ে আর একজন এগোয়। একজন দীপ জ্বেলে দেয় আর একজন সেই আলোয় মণি কুড়োয়। তপতীর কাছে অরুণ প্রেরণা। আবার— কথাটা আজকের নয়, দু বছর আগে এক সন্ধ্যায় লেকের ধারে তিন-জন একসঙ্গে হাঁটছিল, গল্প করছিল। হ্যাঁ, ওদের দুজনের সঙ্গে জয়তীর সেই শেষ বেরোনো, শেষ গল্প করা। তারপর তো জয়তীর বিয়েই হয়ে গেল। কি, বিয়ে না হলেও কি জয়তী আর ওদের সঙ্গে বেড়াতে যেত! কখনো না। যাওয়া ঠিক হত না। সেদিন লেকের জলে সূর্যাস্তের টলোমলো রঙ দেখতে দেখতে অরুণের বুকের রক্ত নেচে উঠেছিল। তাই হবে। না হলে, বলা নেই কওয়া নেই, জয়তীর চোখের সামনে তপতীর দু' হাত হঠাৎ জড়িয়ে ধরে ও চেঁচিয়ে উঠবে কেন: 'তপতী, তোমায় যত বেশি দেখছি আমার তত গল্প লিখতে ইচ্ছে করছে, আমার মনে হয় আমি খুব ভাল গল্প লিখতে পারব।'

লজ্জা পেয়েছিল তপতী। কেননা দিদি তাকিয়ে আছে। জয়তীও আশা করে নি অরুণ এ-ধরনের একটা কথা বলে বসবে। অরুণ তখন থেকেই অবশ্য গল্প লিখত। এ-কাগজে সে-কাগজে অরুণের গল্প বেরিয়েছে শোনামাত্র দু' বোনে কাগজটা কিনে ফেলে লেখাটি পড়ে ফেলেছে। কিন্তু সেদিন হঠাৎ তপতীকে জড়িয়ে তার

ভাল গল্প লিখতে পারার কথায় জয়তীর চেয়ে তপতী যেন চমকে ওঠে বেশি। আর লজ্জা। লজ্জা ঢাকতে তপতী হেসে উঠেছিল: 'কেন, দিদি কি আমার চেয়ে কম সুন্দর? দিদিকে দেখে তোমার, শুধু ভাল না, অদ্ভুত ভাল ভাল গল্প লেখা উচিত।'

আবির-গোলা জল দেখতে দেখতে অরুণ মাথা নেড়েছিল।

'আমার কথাটা তুমি বুঝতে পারছ না। সুন্দর-অসুন্দরের প্রশ্ন উঠছে না। এক-একটি মেয়ে থাকে, ছেলে থাকে, যাদের চোখ দেখলে কবিতা লিখতে ইচ্ছা করে, হাসি দেখলে গল্প লিখতে ইচ্ছা করে, চুল দেখলে ছবি আঁকতে ইচ্ছা করে—তুমি, তুমি সে-জাতের মেয়ে।'

তপতী চুপ ছিল।

জয়তী অন্যদিকে ঘাড় ঘুরিয়েছিল।

অরুণ জলের রঙ দেখছিল।

সেই ছবি জয়তীর আজ মনে পড়ছে। তপতীর মধ্যে গল্প-লেখার আলো ছিল ইশারা ছিল, জয়তীব মধ্যে ছিল না। তাই-না অরুণ আজ নামজাদা গল্প-লিখিয়ে, এবং তাই ভেবে জয়তী এখন একটু বেশি করে হাসল, তপতী শেষ পর্যন্ত নিজের আলো নিজের কাজে লাগাচ্ছে। হ্যাঁ, গল্প লিখছে। কিন্তু—ভাবতে ভাবতে জয়তী জানলার বাইরের আতাগাছটার দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে যায়। স্থির চোখে কচি পাতার কাঁপন দেখে। কেবল নিজেকে দিয়ে নিজেকে দেখে মানুষ কিছু করতে পারে কি। তপতী কক্ষনো গল্প লিখতে পারত না। এখানে অরুণ ওর আলো, ইশারা, ইচ্ছা—গল্প-লেখার দুরন্ত ইন্ধন।

যাকগে। জয়তী তো আর লিখতে পারে না। এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামানো তার ঠিক নয়। এখন সে ভেবে সারা হচ্ছে আধুনিক গল্প-লেখক অরুণ আজ না-জানি কী সাংঘাতিক গল্প সঙ্গে নিয়ে এল। আর আর, তপতী শেষ পর্যন্ত উনিশ বছরের বিধবা রুনিকে

কী করল—কতদূর নিয়ে গেল কে জানে। ঠোঁটে মোচড় দিয়ে জয়তী জানলার কাছ থেকে সরে এসে প্লেট ও কাচের গ্লাসগুলি কাবার্ড থেকে বার করে আস্তে আস্তে মেঝের ওপর রাখে।

হ্যাঁ, জয়তীর মনে পড়ল, সেদিন এস্‌প্ল্যানেডে একসঙ্গে চা খেতে বসে তপতী নাকি অরুণকে জয়তীর কথাও বলেছিল : 'দিদি ফিরে এসেছে। তার স্বামী মারা গেলেন মাত্র ছু'দিন অসুখে ভুগে। লক্ষ্ণৌ কলেজের বটানির বিখ্যাত বাঙালী প্রোফেসার সমীর রায়—'

অরুণ মাথা নেড়ে বলেছিল, 'আমি কাগজে সংবাদ পড়েছি। বড় দুঃখের জীবন তোমার দিদির।'

আর কিছু না, আর কোনও প্রশ্ন করে নি। তা তো বটেই। সাহিত্যিক ছেলে। একটি মেয়ের স্বামী মরে গেল শুনে হঠাৎ মন খারাপ করে এই নিয়ে সতেরোটা কথা বলবে কেন। বিশেষ আজকাল। এ-ধরনের দুঃখ নিয়ে—একটি অল্প-বয়সের মেয়ের বৈধব্য নিয়ে এরা বোধকরি গল্প লিখতেও অপছন্দ করে। সাদামাটা গল্প। এই দুঃখের মধ্যে নতুন কিছু আছে কি। কেবল চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়া? অরুণ বোধহয় সেজন্যই জয়তীর কথা শুনে চুপ করে ছিল—জয়তী এখন ভাবল। আর কেবল দুঃখ পাচ্ছে বলেই তো অরুণ জয়তীকে নিয়ে গল্প লিখবে না। গল্প লেখার অন্য কোনও মালমশলা জয়তীতে নেই। তাই। তাই না? জয়তী নিজেকে প্রশ্ন করল।

॥ ছয় ॥

চেহারাটা একটু মেয়েলি হলেও উদয়নাগ—'আকাশ' কাগজের সম্পাদক উদয়নাগ চক্রবর্তী লম্বা চওড়া পুরুষ। লম্বা ঝুলের সাদা পাঞ্জাবি গায়ে, পরনে সাদা শালোয়ার। হঠাৎ এগজিবিশনে দেখতে পেয়ে ব্যোমকেশ-তনয়া লিলি চঞ্চল হয়ে ওঠে। তারপর কি করে এক ফাঁকে উদয়ের সঙ্গে কথা বলে লিলি যখন জানতে পারে যে তপতীদের বাড়ির সাহিত্য-বাসরে উদয় নিমন্ত্রিত হয়েছে তখন লিলি আর তাকে ছাড়ল না। লিলি ভয়ংকর খুশি হল। ব্যোমকেশ গাঙ্গুলী তখন জাস্টিস রাধারমণ, ডেপুটী মিনিস্টার দত্তগুপ্ত, 'যুগসন্ধি'র এডিটার ভূমেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ছবি দেখছিলেন, ছবির সমালোচনা করছিলেন। সেই ফাঁকে এক বন্ধুর বাড়ি যাবে বলে বাবার নতুন কেনা হাডসন গাড়ি নিয়ে লিলি গাঙ্গুলী 'আকাশ' সম্পাদকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। 'বাবাকে লিফ্‌ট দিতে এখানে মানুষের অভাব হবে না।' ষ্টীয়ারিং-এ হাত রেখে লিলি হেসে বলেছিল। উদয় লিলির পাশে বসেছিল।

'তোমার বাবা এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক—কাজেই—' সিগারেট মুখে গুঁজল বলে উদয়নাগের শেষ কথাটা বোঝা গেল না।

লিলি আড়চোখে সম্পাদককে দেখছিল। বস্তুত উদয়নাগ 'অন্যতম শ্রেষ্ঠ' কথাটা বলতে যে ঠোঁটটা একটু বাঁকা করল লিলির চোখে তা এড়াল না। লিলির পরনে বুটিদার বেনারসী টিস্যু। শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজের রঙ মোটেই ম্যাচ করে নি। কানে এতবড় ছুটো রিং ঝোলানোর কোনও মানে হয় কি। মুখখানা তো এইটুকুন। আর এত কম চুলে কলেজ-খোঁপা করার কী মানে হয়।

'আকাশ'-সম্পাদক উদয়নাগ চিন্তা করল। চিন্তা করে অবশ্য প্রশ্নের উত্তর পেল। আধুনিক ফ্যাশানের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে চাইছে, কিন্তু হালে পানি পাচ্ছে না। কী করে পাবে। ক'দিন আর পয়সার মুখ দেখছে ব্যোমকেশ গাঙ্গুলী উপন্যাস লিখে—তা শুধু রয়্যালটির টাকায় কি আর বাড়ি গাড়ি হত, পর পর কটা বই সিনেমা হওয়ায় না—

'তপতী বলছিল আপনি নাকি আসছেন না।' লিলি প্রশ্ন করে।

উদয়নাগ ক্ষীণ গলায় হাসে।

'আসছি না, মানে সাহিত্যিক হিসাবে সচ্চিদানন্দবাবুর বাড়ির গ্রীষ্ম-বাসরে আমার উপস্থিতিতে সাংঘাতিক আপত্তি উঠবে।

লিলি চুপ করে ছিল।

উদয় লম্বা চুলে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিল, 'তপতী বললে, আপনি কাগজের সম্পাদক হিসাবে আসুন। গল্প পড়ে কাজ নেই। কাজেই শেষ পর্যন্ত তপতীর অনুরোধ—'

লিলি তখনও নীরব।

'অরুণের গল্প, সত্য নন্দীর নাটক, চকোর চ্যাটার্জির কবিতা হজম করার ক্ষমতা নেই যে সাহিত্য-আসরের সেখানে আমি—আমার গল্প—' উদয় থেমে যায়।

'বাবা বলছিলেন, আপনি নাকি বড্ড বেশি সেক্স নিয়ে মাথা ঘামান। আপনার লেখা নাকি পড়া যায় না। আমি অবশ্য খুব ভালবাসি। বাড়িতে লুকিয়ে আপনার "রক্তের দোলা" পড়ে ফেলেছি।' লিলি হাসল।

'বড্ড বেশি সেক্স নিয়ে কথাটা ভুল—তবে সেক্সকে তুমি অস্বীকার করে চলতে পার কি? শরীর থাকলে মন থাকলে ইন্দ্রিয়ও থাকবে। তোমার রুটির ক্ষুধা আছে—টাকার ক্ষুধা আছে, নাম-যশ-প্রতিষ্ঠার ক্ষুধা আছে—সেই সঙ্গে যদি দেহের ক্ষুধা

দেখানো হয় তবে কি সেটা মিথ্যা বলা হবে ? না-বলাটাই মিথ্যা।' একটু থেমে উদয়নাগ বলল, 'আমি বলি নে জীবনে সেক্স সব কিন্তু সব না হলেও অনেকটা, অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে এই ভয়ংকর জিনিস। লরেন্স সাহেব তো সরাসরি একে প্রাইম্যাল লাইফ আর্জ বলে ব্যাখ্যা করে গেছেন। লরেন্সের কোনও বই তুমি পড়েছ ?'

'ডি এইচ লরেন্স ?'

'হ্যাঁ'

'না পড়ি নি।'

'দেব, আমার কাছে বই আছে।'

'বাবা বলেন, তা হলেও এর কথা যত কম বলা যায় ততই মঙ্গল। এ-জিনিস যত উহ্য থাকে তত ভাল।'

'তার মানে আমরা অনেক কিছুই উহ্য রাখতে অনেক কিছু অস্বীকার করতে ভালবাসি।'

'যেমন ?' লিলি ভুরু কুঁচকোয়।

উদয়নাগ হেসে ঘাড় কাত করে।

'যেমন আমরা আজকাল মুখে বলছি আমাদের সাহিত্য বাস্তবানুগ হচ্ছে না, আমরা বড্ড বেশি আকাশমুখী হয়ে আছি—যা এতকাল ছিল, কিন্তু দেখা গেছে বাস্তবে নেমেও আমরা বেশিদূর এগোতে পারি না, থেমে যাই, রিয়্যালিটির সামনে পড়ামাত্র চোখ বুজে থাকি।'

লিলি চুপ।

উদয় বলে চলল, 'কেবল কি সেক্স—সব, জীবনের সকল দিক থেকে চোখ কান গুটিয়ে নেওয়ার মধ্যে আমরা শান্তি পাই। ভান করি—কিছু হয় নি কিছু হবে না। চরম দারিদ্র্যকে স্বীকার করে নিতে আমাদের বাধে না, অশিক্ষার পলিমাটির মধ্যে মুখ গুঁজে থেকে আমরা যুগ যুগ কাটিয়ে দিচ্ছি—সুতরাং—'

'তা হলেও বাবা বলেন সেক্সটা কিছু না, ওটা বাদ দিয়ে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়—আমাদের—'

'ওই-যে বললাম', লিলির কথায় বাধা দেয় উদয়: 'বাদ দেওয়া, উহ্য রাখা, অস্বীকার করার মধ্যে আমাদের বাহাদুরি। যেহেতু ত্যাগ-তিতিক্ষা-বৈরাগ্যের কথা শুনে শুনে আমাদের কান অভ্যস্ত হয়ে গেছে, সেজন্য মানুষের মত বাঁচতে হলে যেগুলো জানা দরকার—যেমন ধর—অর্থনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান—সেগুলো সম্পর্কেও চিরকাল আমরা চরম ঔদাসীন্য দেখিয়ে এসেছি—দরকার নেই বেশি জেনে, দরকার নেই বেশি দেখিয়ে—সাহিত্য? পৃথিবীর মানুষ যখন চাঁদের দিকে পা বাড়িয়েছে, সৌরজগতের সব রহস্য জেনে নিতে আহার নিদ্রা ভুলেছে, তখন আমাদের টনক নড়ল,—আমরা তাকিয়ে দেখলাম সত্যি তো—এতটা এগোন দূরে থাক, হাইড্রোজেন-অক্সিজেনের সাধারণ ক খ নিয়েও একটা বাংলা বই আজ পর্যন্ত লেখা হল না।'

'তা সত্যি।' লিলি এবার হেসে ঘাড় কাত করল।

'সেক্স নিয়ে আলোচনা কোরো না, সেক্স পাপ, সেক্স ভূত—হাউ সিলি!' উদয় নিজের মনে হাসল। 'সে কথাই বলছিলাম, আমরা কিছু জানতে না চাওয়া, দেখতে না চাওয়ার মধ্যে শান্তি পাই, আনন্দ পাই। তুমি কি জান সেক্স-লাইফ—হ্যাঁ, জীবনের এক চরম সত্য রূপকে বোঝাবার জন্য, মানুষকে শিক্ষা দেবার জন্য রাশিয়ায় সিনেমার সাহায্যে রীতিমত নিয়ম করে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে? জার্মানিতেও তাই।'

'কিন্তু সাহিত্যে—' লিলি কি বলতে চাইছিল।

উদয় বাধা দিলে।

'যদি জীবনের সব দিক ফুটিয়ে তোলার, একটা মানুষের একটা সমাজের একটা যুগের পুরোপুরি সার্থক ছবি আঁকবার দায়িত্ব কোনও সাহিত্যিকের থাকে তবে সেক্সকে সে সজ্ঞানে বাদ দেবে কেমন করে?'

একটু থেমে উদয় বলল, 'কিন্তু আমরা তা করি, আমাদের সাহিত্যে নারী পাপীয়সী, নরকের দ্বার—আমাদের সাহিত্যে নারী দেবী, মহামায়া—রক্তমাংসের দেহ নিয়ে পুরুষের সঙ্গে তার স্বাভাবিক সম্পর্কের কথা লিখতে গেলে আমরা ভয় পাই। কেউ লিখছে শুনলে চোখ রাঙিয়ে বলি, সমাজটাকে রসাতলে পাঠালে—যেমন তোমার বাবা।'

লিলি গম্ভীর হয়ে গেল।

উদয় নতুন সিগারেট ধরাল।

'অবশ্য তোমার বাবা যে সমাজ রসাতলে যাবে ভয়ে তাঁর প্রত্যেকটা উপন্যাসে সেক্স-লাইফ বেমালুম বাদ দিয়ে চলেছেন তা নয়—তাঁর আশঙ্কা তিনি পপুলারিটি হারাবেন—তাঁর ভয়, সেক্স-এর গল্প থাকলে এদেশের মানুষ রুচিবান পাঠক তাঁর বই নেবে না। তাই তো তিনি যখন প্রেমের ছবি আঁকতে যান, রক্তমাংসের কথা স্রেফ বাদ দিয়ে প্রেমের চুষিকাঠি নিয়ে ছবি আঁকেন—বিজ্ঞানসম্মতভাবে কাহিনী যেভাবে এগোবার সেভাবে এগোতে না পেরে, জীবন-দর্শন, সত্য জিজ্ঞাসা, জীবনবোধ নিয়ে লম্বা লম্বা বক্তৃতা ঝাড়েন—হ্যাঁ, ভয় তো হবেই—জনপ্রিয় না হবার ভয়ও ভয় বটে—আর ক্রমাগত সেই ভয়ে ভুগে ভুগে মানুষ অক্ষম হয়ে যায়—এখন সেই অক্ষমতাকে ঢাকতে কতকগুলি ফাঁকা বুলি দিয়ে তিনি পাঠককে তুষ্ট করতে চাইছেন ; আজকের পাঠক কিন্তু জীবন সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন হয়ে গেছে, এটা যদিও বা তিনি বুঝতে পারেন কিন্তু করবার কিছু নেই--সেই অক্ষমতার ক্ষতিপূরণ করতে আজ ব্যোমকেশ গাঙ্গুলীর দল--'

লিলি হাতের ঘড়ি দেখল।

'মিটিং আরম্ভ হতে এখনও পুরো একঘণ্টা বাকী- একটু চা খেলে হয় না ?

উদয় হঠাৎ নিজের মনে হাসে।

'শ্লীল অশ্লীল—সুন্দর অসুন্দর।' চোখ বুজে সিগারেটে টান দিয়ে উদয়নাগ টুকরোটা জানলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। গাড়ি একটা মোড় ঘোরে। লিলি ষ্টীয়ারিং নিয়ে ব্যস্ত। সোজা রাস্তা আসতে সে উদয়ের দিকে ঘাড় ফেরায়।

'বুঝলে, লিলি—সত্যিকারের শিল্পী তার সৃষ্টিকে অসুন্দর করতে পারে না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত অশালীন করতে সেও দু'বার চিন্তা করে—তবে এটা ঠিক, আকাশচারিতা সে চায় না; জীবনের সত্যকে ঢাকতে কতকগুলি মিথ্যা তত্ত্ব আদর্শ টেনে এনে কাহিনীকে বিকৃত করতে তার রুচিতে বাধে।'

লিলি গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেয়।

'আসুন, ওই তো ভালো রেস্তোরাঁ রয়েছে, একটু চা খাওয়া যাক—চা খেতে খেতে আপনার কথা শুনব।'

'আমার কথা তোমার নিশ্চয়ই ভাল লাগছে?' উদয় খুশি হল। 'এসো, একটা নতুন গল্প লিখেছি—তোমায় শোনাব।'

॥ সাত ॥

আশ্চর্য, রেস্তোরাঁ পাশে রেখে উদয়নাগ কোথায় ঢুকছে! কার্পেট বিছানো সিঁড়ি বেয়ে ছুজন ওপরে উঠছে। উদয়নাগ আগে, লিলি পিছনে। সিঁড়ির ছুপাশে বাহারী পাতার বড় বড় পিতলের টব বসানো রয়েছে। কার্পেটগুলো সুন্দর।

'আমরা কোথায় এলাম?' অনুচ্চ গলা লিলির।

'এই গরমে চা খেতে ইচ্ছা করে না।' ঘাড় ফিরিয়ে উদয়নাগ মৃছ হাসল। 'একটু বীয়ার খাব। এটা বার।'

যেন পা ছুটো ঈষৎ কেঁপে উঠল লিলির।

'মদের দোকান! আমবা কি—' লিলিব গলার স্বর কেমন অপরিচ্ছন্ন হয়ে উঠল। উদয়নাগ আব কিছু বলে না, সিঁড়ি ভাঙে। এবং লিলিও যে দাঁড়িয়ে রইল বা নেমে এল তা নয়। উদয়নাগকে অনুসরণ করে ওপরে উঠতে থাকে। যেন নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ কবে দাঁড়িয়ে পড়ার বা নীচে নেমে আসার কোনটাই সে পারছিল না। উর্দি পরা বয় ছুজনকে সেলাম জানায়। হঠাৎ মনে হয় কেমন একটা কড়া ওষুধের গন্ধ লিলির নাকে ঢুকছে। এবং ভিতরে ঢুকতে না ঢুকতে তার মনে হয় ওষুধের গন্ধটা মিলিয়ে গিয়ে চপ-কাটলেট ভাজার মোলায়েম মিষ্টি গন্ধ সে পাচ্ছে, সেটাও বেশিক্ষণ থাকে না, তার পরিবর্তে কাঁচা পেঁয়াজের গন্ধের মত একটা ঝাঁঝালো গন্ধ তার নাকে ঢোকে এবং এক মিনিট পর তাও মিলিয়ে যায়, সব গন্ধ ছাপিয়ে সিগারেটের ধোঁযার গন্ধ লিলির নাসারন্ধ্র ছুটোকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। চারদিকে তাকিয়ে দেখল ও, ছোট ছোট টেবিল ঘিরে ছু জন তিন জন চার জন করে বসে আছে। টেবিলে টেবিলে কাচের গ্লাস। গ্লাসে গ্লাসে সোনালী রঙ

জাফরান রঙ কালো রক্ত রঙ তরল পানীয় টলমল করছে। পুরুষ আছে মেয়ে আছে। পুরুষের হাতে সিগারেট, দু একটি মেয়ের হাতেও লিলি সিগারেট দেখতে পেল।

'বসো, ওই চেয়ারটায় বসো।' যেন একটি ছোট মেয়েকে উদয়নাগ আদেশ করছিল।

কথা না কয়ে লিলি চেয়ারে বসে পড়ল। যেন একটা যন্ত্র হয়ে গেছে ও। কথা সরছে না মুখ দিয়ে। তার কপালে নাকের ডগায় ঘাম। রুমাল দিয়ে কপাল নাক মুছতে লিলির হাত সরছে না। অবশ্য ঘামটা মিনিট দু তিনের মধ্যে মজে যায়। মাথার ওপর জোরে পাখা ঘুরছিল। বরং একসময় লিলি টের পায় ঘাম শুকিয়ে তার মুখটা কেমন শুকনো খরখরে হয়ে উঠেছে। হাওয়ায় তার কপালের একটা চুল সাপের ল্যাজের মত নড়ছিল।

'কি খাবে?'

'আমি কিছু খাব না—প্লিজ।' যেন এবার অনেকটা স্বাভাবিক হতে পারল লিলি। হাসল। উদয় হাসল। লিলিকে স্বাভাবিক হতে দেখে উদয়নাগ নিশ্চিন্ত হল, লিলি বুঝতে পারে। লিলির এটা ভাল লাগে।

'কই, আপনার গল্প বার করুন।'

'হবে।' উদয় লিলির দিকে তাকায় না। বয় এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। উদয়নাগ ফিস ফিস করে তার সঙ্গে কথা বলছে। কথা শেষ হতে উদয় ঘাড় ফেরায়। বয় চলে যায়।

'আমি কিন্তু কিছু খাব না।' লিলি একটু গম্ভীর হয়ে কথাটা আবার উদয়কে মনে করিয়ে দিলে।

'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।' উদয়নাগ নুয়ে প্রায় টেবিলের সঙ্গে মাথাটা ঠেকিয়ে সিগারেট ধরায়। একবারের চেষ্টাতেই সিগারেট ধরাতে পারে। অ্যাশট্রের ভিতর কাঠিটা গুঁজে দিতে দিতে সে লিলির দিকে তাকাল।

'একটু মদ খেতে তোমার আপত্তি কেন।'

'কোনদিন খাই নি।' লিলি লাল হয়ে উঠল।

'কোনদিন খাও নি বলে তো একদিন খেয়ে দেখতে হয়।' কথার সঙ্গে প্রচুর ধোঁয়া বেরোয় উদয়ের মুখ থেকে। 'সব কিছুর অভিজ্ঞতা থাকা ভাল।'

মুখ নামিয়ে লিলি আঙুল দিয়ে টেবিলের বনাত খোঁটে।

'কথা বলছ না কেন?' যেন ধমক লাগায় উদয়।

লিলি মুখ তোলে।

'ভয় করছে।'

'কেন?' একটু চুপ থেকে উদয় বলল, 'খারাপ কিছু আছে এর মধ্যে? তুমি রেসের মাঠে গিয়েছ কোনদিন? ঘোড়দৌড় দেখেছ?'

লিলি মাথা নাড়ল।

'খেলার মাঠে? ময়দানে ফুটবল ক্রিকেট খেলা দেখেছ এক আধ দিন? সিনেমা তো হামেশাই দেখ।'

'তা দেখি।' ঘাড় কাত করল লিলি।

'তা হলে চল একদিন রেসকোর্স দেখে আসি। যাবে?' উদয় লিলির চোখ দুটো পরীক্ষা করে। লিলি কথা না কয়ে আবার মিটিমিটি হাসে।

'বুঝলে, সব দেখতে হয় জানতে হয়। অন্তত আমার তাই ধারণা।'

'আপনি সাহিত্যিক। গল্প লেখেন। আপনার সব দেখার জানার দরকার। আমি তো লিখছি না।'

'না, তা নয়—' উদয়ের কথায় বাধা পড়ল। বোতল গ্লাস এনে টেবিলের ওপর জড়ো করল বয়।

'একটু একটুখানি—' লিলি ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'হ্যাঁ, একটুখানি, টেস্ট করে শুধু দেখবে। থাক আর ঢালতে হবে না।' লিলির সামনে গ্লাসটা বাড়িয়ে দিলে উদয়। যাও, মেনু

নিয়ে এস।' সোডার বোতল টেবিলে তুলে দিয়ে বয় সরে গেল।

'বুঝলে, তুমি যদি আজকের পৃথিবীকে না জান না দেখে থাক তো আজকের মানুষগুলোও তোমার কাছে অচেনা অজানা থেকে যাবে। তাই নয় কি।' উদয় গ্লাসে চুমক দেয়। লিলিও গ্লাস তুলে ছোট্ট একটা চুমুক দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চেহারাটা বিকৃত করে ফেলে। 'বীয়ার ?'

'হুইস্কি।' আর একটা বড় চুমুক দিয়ে উদয় হাতের গ্লাস নামিয়ে রাখে। 'বীয়ারে জলতৃষ্ণা নিবারণ হয়—মেজাজ আনতে হুইস্কির দরকার। না, বলছিলাম, আধুনিক গল্প উপন্যাসের চরিত্র, তাদের মেজাজ, দৃষ্টিটাই তোমার কাছে অস্বাভাবিক অসম্ভব ঠেকবে যদি আধুনিক পৃথিবীকে তুমি না দেখে থাক। কাজেই উপন্যাস লেখকের অভিজ্ঞতাই সব নয়, পাঠক পাঠিকাকেও সাবালক হতে হবে—চোখ কান খোলা রেখে তবে মডার্ন নাটক নভেল কবিতা গল্প বুঝতে হবে।'

'তা সত্যি।' লিলি এবার গ্লাস তুলে ছোট চুমুক লাগায়। মুখটা আর তত বিকৃত হয় না। ঠোঁটটা ঈষৎ বেঁকে উঠতে না উঠতে সুন্দর একটা হাসির মোচড় লাগিয়ে লিলি সেটাকে কাজে লাগায়। তার চোখের তারা দুটো এবার ঝকঝকে হয়ে ওঠে।

টেবিলে মাংস এসে যায়।

'খাও।' উদয় পকেট থেকে একটা পাণ্ডুলিপি বার করল। লিলি সাগ্রহে হাত বাড়ায়। 'এখন না। আর একটু মেজাজ আসুক তোমার। মনটা আর একটু আধুনিক হোক। তা না হলে তুমি আমার গল্পের নায়ক নায়িকাদের বুঝতে পারবে না। অবিচার করবে তাদের ওপর।'

উদয়ের কথা শুনে লিলি খিলখিল করে হেসে উঠল। 'শোন কথা। আমি কি বলি নি আপনার 'রক্তের দোলা' আমার ভাল লেগেছে।'

'ভাল লাগা আর বুঝতে পারা কি এক ?' উদয়নাগ গ্লাস শেষ করে বয়কে ডাকল। 'পেগ্।' ঘাড় কাত করে বয় আবার মদ আনতে ছুটল। লিলি ঠোঁটের কাছে গ্লাস তুলল এবং সেই অবস্থায় মাথা নাড়ল। 'আমি কিন্তু আর এক ফোঁটাও স্ট্যাণ্ড করতে পারব না।'

'মোটে তো আধ পেগ খেলে।' উদয়ের চোখের রঙ লাল হয়ে উঠেছে। 'হ্যাঁ, কি বলছিলাম। ভাল লাগা আর বুঝতে পারা। ধর আমি শিবাজীর আমলের কিছু চরিত্র নিয়ে একটা গল্প লিখলাম। লেখা ভাল হল। তোমার পড়তেও ভাল লাগল। কিন্তু চরিত্রগুলো বুঝতে কষ্ট হবে না কি ?

'তা হবে।' শূন্য গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে লিলি রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছল। 'সেই যুগের মানুষের ভাবনা চিন্তা রীতি নীতি সমাজ সম্পর্কে যখন ভাল আইডিয়া নেই—'

'হিয়ার !' উদয় তার বাবরি চুলে ঝাকুনি দিলে। 'অমুক চরিত্রটা কত পার্সেণ্ট সত্য হল, অমুক চরিত্রটা কত পার্সেণ্ট মিথ্যা হয়েছে যাচাই কবতে তোমার অসুবিধা হচ্ছে। কেবল গল্পটাই পড়ে যাচ্ছ। তাই না ?'

'তাই।' চোখ বড় করে লিলি একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। বয় মদের বোতল নিয়ে এল। উদয় দুটো গ্লাসই বাড়িয়ে দেয়। উদয়ের গ্লাসে পেগ ঢালা হয়ে যেতে লিলির গ্লাসে পুরো পেগ ঢালা হয়। যেন একটু অবাক হয়ে লিলি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকে, কিন্তু কিছু বলে না। সোডার বোতল টেবিলে তুলে দিয়ে বয় চলে গেল।

'খাও।' উদয় লিলির দিকে গেলাস ঠেলে দিয়ে নিজেরটা তুলে নেয়। তারপর, 'হ্যাঁ কি কথা হচ্ছিল—তোমার বাবা সেরকম গল্প উপন্যাস লিখছেন। মানুষ আছে, এবং এ-যুগের মানুষ নিয়েই তিনি কারবার করছেন—কিন্তু নিজে যুগ থেকে সরে আছেন বলে তাঁর

গল্পের একটা চরিত্রও বোঝা যায় না—আজ পর্যন্ত একটাও আধুনিক চরিত্র তিনি আঁকতে পারেন নি।'

'বাবা একটা বোগাস।' লিলি আগের চেয়েও জোরে খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসির বেগে চোখের পাতা কাঁপছিল। চোখের তারা দুটো আগের চেয়েও বেশি ঝকঝকে হয়ে উঠেছে। চোখের সাদা অংশে এবার লালের ছিটা দেখা দিতে শুরু করেছে, উদয় লক্ষ্য করল।

'নাও, এই বেলা আমার গল্পটা পড়ে ফেল।'

'এখনই, এখানে?' কোল থেকে উদয়ের পাণ্ডুলিপিটা বাঁ হাতে তুলে লিলি কেমন যেন অসহায় চোখে চারদিকে তাকায়। উদয় বুঝতে পারে। বেজায় গোলমাল হচ্ছে। ক্রমশ যেন ভিড় বাড়ছে! কেবল কথা নয়, চিৎকার এবং কেউ কেউ গলা ছেড়ে গান গাইতে আরম্ভ করেছে মদের গেলাস সামনে রেখে। কেউ টেবিল চাপড়াচ্ছে।

'এখানে গল্প পড়া হয় না।' উদয় বিড়বিড় করে উঠল, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে লিলির চোখে চোখ রাখল। 'চল, আমরা পর্দা ঘেরা ওই কামরায় গিয়ে বসি।'

'দি আইডিয়া!' মদের গেলাস হাতে নিয়ে লিলি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। কাঁধের আঁচল মাটিতে লুটোয়।

'বয়!' উদয় হাঁকল। বয় ছুটে এল। 'কামরা খালি?' 'জি সাব্।' বয় তৎক্ষনাৎ ছুটে গিয়ে পাশের কামরার পর্দা সরিয়ে দেয়। উদয় ও লিলি কামরার মধ্যে ঢুকে পড়ে। বয় পর্দা টেনে দেয়। পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসল দুজন।

'পড় এইবেলা।' লিলির কাঁধে হাত রাখল উদয়। লিলি অপাঙ্গে উদয়ের মুখ দেখল ও খিলখিল করে হাসল; উদয়ের উষ্ণ নিশ্বাস তার গালে লাগছে টের পেয়ে ও পাশের চেয়ারটার সঙ্গে আরও ঘন হয়ে বসে।

'পার্ক-স্ট্রীটের সাহিত্য-বাসর বোধ করি এখন আরম্ভ হল।'

'হোক।' উদয় এবার গেলাসে চুমুক দিয়ে মুখটাকে বিকৃত করে ফেলল। 'তোমার বাবা যে-বাসরের সভাপতি সেখানে আমার যেতে একটুও ইচ্ছে নেই।'

'আমারও না।' পড়তে আরম্ভ করবে বলে লিলি উদয়ের লেখা গল্পটা চোখের সামনে মেলে ধরে।

'আমাদের সাহিত্য-বাসর আজ এখানেই হবে, এখানেই হচ্ছে, তাই না লিলি?'

'তাই।' পাণ্ডুলিপির ওপর চোখ বুলিয়ে লিলি রুদ্ধশ্বাসে উদয়নাগের নতুন গল্প পড়তে আরম্ভ করল ঃ

ওরা তিনজনে এসে সামনে দাঁড়াল।

সাহিত্যিক চোখ তুলে তিনটি মুখ দেখল। খুব ফরসা, একটু ফরসা, আর রাত্রির মতো কালো রং তিন কুমারী।

সাহিত্যিক তাকিয়ে দেখছিল বেতডগার মত লম্বা লিকলিকে তিনটি শরীর।

'কি চাই?'

'গল্প।'

সর্বেশ্বর চোখ বুজল, মাথা নাড়ল।

মনের চোখে সর্বেশ্বর তিনজনের মুখের অবস্থা দেখছিল। 'হ্যাঁ' বললে তাদের চোখ কেমন হবে এবং 'না' বললে তাদের ঠোঁট কেমন হবে সাহিত্যিক চিন্তা করছিল। চোখ না খুলে সর্বেশ্বর বলল, 'আমি লিখে লিখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখন তো পুজো এসে গেছে, অত দেরি করে না এসে আর দুদিন আগে —'

পাখির মত কলরব করে উঠল তিনটি গলা।

'তাতে কি, আমাদের খুব বেশি একটা তাড়া নেই—পুরো দুটো দিন তো সময় দিচ্ছি—আপনার পক্ষে দুদিনই যথেষ্ট নয় কি? আপনি সাত দিনে তিনশ পাতার উপন্যাস লিখে ফেলেছেন।

দশ দিনে হাজার পাতার এক একটা "সাগা" নামাচ্ছেন। আপনি—'

চোখ না তুলে ক্লান্ত গলায় সর্বেশ্বর হাসল।

যেন সাহিত্যেকের হাসি দেখে তিন কুমারী আশ্বস্ত হল। চৌকাঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, এবার তারা সর্বেশ্বরের টেবিল ঘেঁষে দাঁড়ায়। সর্বেশ্বরের লেখার টেবিল ছুঁতে পেরে তারা খুশি হয়।

সর্বেশ্বর চোখ খুলল।

রামধনুর মত ছড়ানো বাঁকা ভুরু খুব-ফরসা মেয়ের, ঘাসের শিষের মত চিকণ পাতলা ভুরু একটু ফরসা মেয়ের, রাত্রির মত—কালো-রঙের মেয়ের ভুরু ছুটি জোড়া, জোড়া ও একটু মোটা। যেন একটা শুঁয়ো পোকা বাঁকা হয়ে আছে। ভয় করে, না দেখতে বরং ভাল লাগে।

সর্বেশ্বর চোখ বুজল।

'আমি ক্লান্ত। কদিনে এত গল্প লিখেছি যে আঙুলগুলো টনটন করছে, মেরুদাঁড়ায় ব্যথা হয়ে গেছে, মাথা ঝিমঝিম করছে—'

'তা হলেও একটা গল্প লিখে দিতে হবে, আমাদেব অনুরোধ।'

'এত গল্প লিখেছি কদিনে যে মাথার ভিতরটা ফাঁকা হয়ে গেছে, বুকটা খালি হয়ে গেছে, মন ধূ ধূ করছে। মনে হয় আমি একটা মরুভূমি হয়ে গেছি, মনে হয় না আব বেশ কিছুদিন আমাব ভিতরে গল্পের ঝর্ণা বইবে।'

পাখির মত কলরব করে তিন কুমারী হেসে উঠল।

সর্বেশ্বর চোখ বুজে মাথা নাড়ল।

'শুকিয়ে গেছি, একেবারে খটখটে হয়ে গেছে মন প্রাণ হৃদয়। মগজে আর কিছু নেই, বড্ড দেরি করে ফেললেন আপনারা।'

সর্বেশ্বরের মনে হল তিন জন মুখ চাওয়া চাওয়া করছে। চোখ খুলল সে।

খুব-ফরসা মেয়ের মাথার চুলে লাল দোপাটি ফুল, একটু ফরসা

মেয়ের চুলে নীল অপরাজিতা, রাত্রির-মত-কালো, অন্ধকারের মতো মেয়ের চুলে রক্তকরবী। খুব-ফরসা মেয়ে অতসী রঙ শাড়ি পরেছে, একটু-ফরসার পরনে আকাশ রং, রাত্রি-কালো মেয়ের রক্তজবা বসন। নির্ধূম অগ্নিশিখা হয়ে চোখের সামনে জ্বলছে।

সাহিত্যিক তাড়াতাড়ি চোখ বুঝল।

'কিন্তু একটা কথা—আপনাদের অজানা নেই, আমি ভয়ংকর অশ্লীল গল্প লিখি, লোকে তাই বলে—আমার লেখার মধ্যে তারা লালসার গন্ধ পায়, নারী-মাংস ছাড়া আর কিছু খুঁজে পায় না আমার গল্পে, ছোট উপন্যাসে, আমার সাগা টাইপের বড় বই দুটোতে।'

তিন কুমারী যেন কিছুটা আশ্বস্ত হল, কলকল করে উঠল।

'লোকের কথা ছেড়ে দিন। লোকে আপনাকে গালমন্দ করে, আবার লুকিয়ে আপনার বইই বেশি পড়ে।'

'না, তারা বলছে, আমার লেখা বুড়োদের বেশি ক্ষতি করতে পারে না। তারা জীবনের উনুনের পোড়া কাঠ। আগুন আর তাদের গায়ে লাগে না। ভয়, কম বয়সের ছেলেমেয়েদের নিয়ে, ভয় তরুণদের জন্য তরুণীদের জন্য।'

'আমরা ভয় করি নে, আমাদের আগুন লাগার ভয় নেই। আপনি নির্ভয়ে সুন্দর একটা গল্প লিখে দিন।'

'আপনাদের কাগজের নাম?'

'সাগর।'

'সুন্দর নাম।'

'আমাদের মন সাগরের মত উদার, বিস্তৃত, স্বাধীন, মুক্তগতি। আমাদের কাগজে আপনি আপনার খুশি মতন গল্প লিখে দিতে পারেন।'

টেবিল ঘেঁষে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ তারা। এবার টেবিলের ওপর তিনজনে ঝুঁকে পড়েছে। তারা কি মনোযোগ দিয়ে

সর্বেশ্বরের আঙুলগুলি দেখছে? শুইয়ে রাখা বন্ধ কলমটা দেখছে? সর্বেশ্বরের প্যাডের গোলাপ-রঙ কাগজ দেখছে? সিগারেটের টিন দেখছে? কি দেখছে? দেখে নিতে সাহিত্যিক চোখ খুলল।

সর্বেশ্বরের মুখ দেখছিল তিন কুমারী। হরিণের মত বড় বড় কালো চোখ দুটো মেলে খুব-ফরসা মেয়ে সর্বেশ্বরের কপালের রেখা দেখছে, একটু-ফরসা মেয়ে সর্বেশ্বরের নাকের বাঁক দেখছে, আর রাত্রির-মতো-নিবিড়-কালো মেয়ে অরণ্যের চিতার মত আগুন-জ্বলা সরু চোখ দুটো মেলে সর্বেশ্বরের ঠোঁট দেখছে। মৃদু হাসল সাহিত্যিক।

'আপনাদের গল্পে প্রচুর সেক্স থাকে যদি? মানে যদি এমন একটা গল্প লিখে আমি আপনাদের কাগজে দিই?'

'আপত্তি নেই।' খুব-ফরসা মেয়ে বলল।

'আমার ভাল লাগবে।' একটু-ফরসা মেয়ে বলল।

'ওই গল্পই তো আমরা নিতে এসেছি।' কালো মেয়ে ঢোক গিলল। ঢোক গেলার শব্দটাও সর্বেশ্বরের কানে গেল।

'আমার গল্পে বড় বেশি দাহ—জ্বালা থাকবে।'

'কিসের জ্বালা?' খুব-ফরসা মেয়ে প্রশ্ন করে।

'লালসার।' সাহিত্যিক চোখ বুজল। 'কামনার—ইচ্ছার।'

'একটু মিষ্টি মতন করে দেখালে হয় না?' গলার স্বরে সর্বেশ্বর বুঝতে পারে ফরসা মেয়ের প্রশ্ন।

সর্বেশ্বর সজোরে মাথা নাড়ল।

'আমার গল্পে মিষ্টি প্রেম নেই, মিষ্টি প্রেম বলে কোন জিনিস আছে আমি বিশ্বাস করি নে। যদি মিষ্টি আখ্যা দেওয়া হয় তবে বলব ওটা প্রেম না, ভালবাসা না—ওটা সোনার পাথর-বাটি।'

যেন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল তিনজন।

চোখ না খুলে সর্বেশ্বর প্রশ্ন করল, 'সৃষ্টির মূলে কি আছে?'

'মিলন।' তিনজন এক সঙ্গে উত্তর করল।

'সৃষ্টি সুন্দর ?'

'হ্যাঁ, সব না—ফুল পাখি মানুষ সুন্দর।'

'আবার কুৎসিত সৃষ্টিও আছে, ভয়ংকর জীব হিংস্র প্রাণী। মানুষও কদর্য চেহারার কুৎসিত চরিত্রের থাকতে পারে।'

'তা ত আছেই—সুন্দর মানুষ সুন্দর একটি প্রাণ নিয়ে আপনি লিখুন!'

'কিন্তু সুন্দর প্রাণ কি সুন্দরভাবে পৃথিবীতে আসে ?' সিদ্ধেশ্বর চোখ খুলে তাকাল।

তিনজন নীরব নতনেত্র।

'আমার কথার উত্তর দিন ?'

উত্তর না শুনে সর্বেশ্বর তিনজনের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেল। যেন জমি তৈরী হয়ে এসেছে, বুঝতে পেরে সর্বেশ্বর এবার সোজা-সুজি বলল, 'ভালবাসার— প্রেমের যদি পরিণতি দেখাতে হয় তবে তা ভয়ংকর হবে না কি, হয়তো অসুন্দরও, আর সেই ভয়ংকর যখন ব্যর্থ হয়—প্রেম যখন ভয়ঙ্কর অসুন্দর হওয়ায় পথে বাধা পায় তখন কি তা প্রলয় সৃষ্টি করে না ?'

কথা শেষ করে সর্বেশ্বর হাসল।

'কাজেই সোনার পাথর-বাটির প্রেমের গল্প, মিষ্টি সেক্সের, মানে বাচ্চার হাতের চুষিকাঠির গল্প আমি লিখি না, লিখতে পারি না।'

খুব-ফরসা মেয়ে একটু-ফরসা মেয়ের দিকে চোখ ফেরায়, একটু-ফরসা রাত্রি-কালো মেয়েকে দেখে। কালো মেয়ে আবার সর্বেশ্বরের ঠোঁট দেখছে।

'দাহ, জ্বালা থাকবে আপনার গল্পে—কে জ্বলবে, কে পুড়বে, পুরুষ না নারী ?'

'নারী।' নির্মম হয়ে উত্তর দিলে সর্বেশ্বর।

কালো মেয়ের চিতা-চোখ ভয়ংকর হয়ে জ্বলছিল।

'কেন ?'

'আমার ইচ্ছা, আমি জ্বালাব।'

'আপনার ইচ্ছায় সব হতে পারে না।' খুব-ফরসা মেয়ে বলল।

'আপনি না জ্বলতে পারেন, আপনার গায়ে আগুন না লাগতে পারে। কিন্তু আমার গল্পের মেয়ে জ্বলছে পুড়ছে—আর এমন মেয়ে আছে বলেই আমি গল্পে তাকে আনছি।'

খুব কালো মেয়ে চুপ করে রইল।

'ছেলেটি মেয়েটিকে ফাঁকি দিচ্ছে?' একটু-ফরসা মেয়ে প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ।' সর্বেশ্বর বলল, 'মেয়েটি মোটেই দেখতে ভাল নয়।'

তিন কুমারী আবার খিলখিল করে হেসে উঠল, তিন সুন্দরী।

'তাই বলুন, তবে ত এমনটি হতেই হবে। মেয়েটি যদি দেখতে ভাল হত তবে কি আর—'

গম্ভীর গলায় সর্বেশ্বর বলল, 'দেখতে এককালে ও খুবই ভাল ছিল। তার চোখ তার ভুরু নাক ঠোঁট দেহের গড়ন রঙ, সবই সুন্দর।'

'তবে?' একটু-ফরসা মেয়ে ভুরু কুঁচকোয়।

'কেন এমন হল!' খুব-ফরসা মেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। রাত্রির মত গভীর কালো মেয়ে শুধু তাকিয়ে থাকে, তাকিয়ে দেখে সর্বেশ্বরের ঠোঁট, কপাল।

সার্বেশ্বর চোখ বুজল।

'বললাম তো, মেয়েটি যখন বুঝল ছেলেটির প্রেমের মধ্যে কিছুই নেই, সব ফাঁকি—ওর ভালবাসাটা শিশুর হাতের চুষিকাঠি ছাড়া আর কিছু নয় তখন মেয়ের শরীর ভাঙতে লাগল, লাবণ্য ঝরতে লাগল।'

'ইস্, পুরুষগুলো কী নিষ্ঠুর!' একটু-ফরসা মেয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ায়। ওর কথার ধরনে সর্বেশ্বর বুঝল। চোখ না খুলে সে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসে।

'আমার নায়ক কিন্তু মোটেই নিষ্ঠুর নয়।'

'তার অর্থ!' তিন কুমারী এক সঙ্গে ক্ষেপে উঠল। 'আপনি পুরুষ লেখক কিনা তাই নায়কের দিকে ঝোল টানছেন।' বলে তারা থামল। তারপর তিনজন বলাবলি করল: 'বেশির ভাগ লেখক পুরুষ, মেয়েরা মোটেই লিখছে না, তাই তো মেয়েদের জ্বলুনি পোড়ানি কমছে না—যা-তা করে খেয়ালখুশি মত ওরা আমাদের আঁকছে। মেয়েটি ভালবাসল ছেলেটিও ভালবাসল, তারপর ছেলের ভালবাসার ফাঁকি ধরা পড়ল, মেয়েটি জ্বলছে, জ্বলে জ্বলে ও কুরূপা হয়ে গেল; আর সর্বেশ্বর রুদ্র বলছেন কিনা ছেলেটির দোষ নেই। এটা পুরুষ লেখকের পক্ষপাতিত্ব ছাড়া আর কী বলা যায় ভাই!'

'একটু ধৈর্য ধরে শুনুন আমার গল্প।'

তিন জন চুপ।

তিন জনের চোখ দেখতে দেখতে সর্বেশ্বর বলল, 'মেয়েটির প্রেমে ছেলেটি সাড়া দিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, তারপর?' তিন কুমারী সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

'তাদের বিয়েও হল, যেমনটি চেয়েছিল দুজন।'

'স্বাভাবিক – সুন্দর।' খুব-ফরসা মেয়ের চোখ উজ্জ্বল হল। 'তারপর?'

'তারপর আর কি, মাস যায় বছর যায়, মেয়েটা বুঝতে পারল একটা চুষিকাঠি নিয়ে ও আছে, একটা ফাঁকি ও কামড়ে ধরে আছে।'

'কেন, ছেলেটি বিয়ে করেই এমন হৃদয়হীন হয়ে গেল কেন শুনি?' একটু-ফরসা মেয়ে ভুরু কুঁচকোলো।'

'হৃদয়হীন মোটেই নয় বরং ছেলেটি তখন আরও বেশি করে ভালবাসছে তার বউকে,– ছেলেটি তার উপার্জনের অর্থ শ্রম নিষ্ঠা মনোযোগ– সব উজাড় করে ঢেলে দিচ্ছে মেয়ের পায়ে—তবু—।'

'আপনি পরিষ্কার করে বলুন।' রাত্রি-কালো মেয়ের চিতা-চোখ জ্বলে উঠল। 'তবু মেয়েটি কেন সুখী নয়!'

'ওই যে বললাম চুষিকাঠি— সৃষ্টির মূলে আছে প্রেম, মিলন, আর সেই প্রেম যদি কিছু সৃষ্টি করতে না পারল তো তা ফাঁকি ছাড়া কি!'

'তবে কি—' বলতে বলতে তিন কুমারী কেঁপে উঠল। যেন এর মধ্যেই তিন জনের চুলের ফুল শুকিয়ে যাচ্ছে সর্বেশ্বর লক্ষ্য করল। ক্ষীণ গলায় হাসল সে।

'হ্যাঁ, তাই, নারীর কামনায় আছে রস, লাবণ্য। পুরুষের কামনায় আছে শক্তি, আগুন।—এখন মেয়েটি যদি তার প্রাপ্য জিনিস থেকে দিনের পর দিন বঞ্চিত হতে থাকে তবে কি ও কাঁদবে না, জ্বলবে না, আর ভিতরে ভিতরে একটা প্রচণ্ড বিষুবিয়স হয়ে উঠবে না—যার থেকে পৃথিবীতে অনেক প্রলয় সৃষ্টি হয়েছে, বলুন?'

তিন জন নীরব, অধোবদন।

'কাজেই দেখতে পাচ্ছেন, সোহাগ করে একে প্রেম ভালবাসা পীরিত প্রণয় যা-ই বলুন—তার পরিণতি এক জায়গায়, হাঁ৷ রক্ত-মাংস, একেই আমরা সেক্স বলি। দেব গল্পটা লিখে? চলবে আপনাদের কাগজে?'

তিন কুমারী চাওয়া-চাওয়ি করল। গাল লাল হল। যেন তিন জনের ঠোঁটে ঠোঁটে ভাঙাচোরা অনেক হাসি উঁকি দিতে লাগল। তারপর নীচু গলায় বলল, 'দিন লিখে।'

'কিন্তু দেখবেন, লোকে যখন পড়ে বিচ্ছিরি সেক্স-এর গল্প বলবে তখন যেন আমার দোষ দিতে তিন জনে ছুটে আসবেন না, তখন আপনারা আমাকে সমর্থন করবেন ত?'

এবার হাসতে হাসতে তিন জন এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। যেন তিনটি নদীতে বান এসেছে।

'আচ্ছা, আচ্ছা তখন দেখা যাবে, তখন দেখব—হ্যাঁ, কেন সমর্থন করব না, আপনি ত আর মনগড়া কথা লিখছেন না, যা সত্যি—'

সর্বেশ্বর রুদ্র হেসে বলল, 'দক্ষিণা রেখে যান, পরশু বিকেলে এসে লেখা নিয়ে যাবেন।'

পড়া শেষ করে লিলি স্তব্ধ হয়ে যায়। গেলাসের তলায় জাফরান-রঙ টলটলে পানীয়টুকুর মত তার চোখের ভিতরটা টলটল করছে, জ্বলছে।

'কেমন লাগল?' উদয়ের হাতটা লিলির কাঁধ থেকে কোলের ওপর নেমে এল। 'ভাল হয়েছে লেখা?'

'আশ্চর্য ভাল লেখা। আমার মনে হয় এর চেয়ে সত্য করে সুন্দর করে কোন লেখক একটি ছেলে ও মেয়ের কথা লিখতে পারে নি।' কি একটু ভেবে পরে লিলি প্রশ্ন করল: 'আচ্ছা, মেয়েটি এই অবস্থায় কী করবে? আত্মহত্যা?

উদয়নাগ হাসল।

'হত্যা করতেই বা দোষ কি, কামনার স্রোতের মুখে পাথর চাপা পড়লে কী ভয়ংকর আলোড়ন সৃষ্টি হতে পারে তোমাকে কি তা—'

উদয় কথাটা শেষ করল না। লিলি বুঝল, বুঝতে পেরে একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল।

'ইস্, এত ভাল হয়েছে আপনাব লেখাটা, ইচ্ছা করছে বুকে করে রাখি।'

'রাখ না, রাখ—তোমার বুকের মধ্যেই রাখ এখন ওটা—দাও পাণ্ডুলিপিটা আমি রেখে দিচ্ছি।' কোলের ওপর থেকে লিলির বুকের কাছে হাত ওঠায় উদয়।'

'আমি পারব, আমি রাখছি।' লিলি হঠাৎ একটু কুঁজো হয়ে বসে হাসে: 'আচ্ছা দাঁড়ান দাঁড়ান, ব্লাউজের বোতামটা খুলে নিই।'

যেন কোথায় পিয়ানো বাজে, নিওন জ্বলে উঠল মাথার

গুপায়। বাইরে রোদ মুছে যাচ্ছিল বলে ভিতরটা অন্ধকার লাগছিল, এখন তরল জ্যোৎস্নার বান ডাকল।

'আর একটু খাবে?' উদয় শুধায়।

লিলি মাথা নাড়ে।

'খেলাম তো, খাচ্ছি তো, আর কত!'

'জীবন ও সাহিত্যকে আমরা একত্র মেলাতে পেরেছি, তাই তো চাইব আমরা, কেমন না?'

কথা না কয়ে লিলি চোখ বুজে ঘাড় কাত করল। পুরুষের উষ্ণ গাঢ় নিশ্বাস বুকের কাছে গলার কাছে অনুভব করতে করতে ও সত্যি নেশাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

॥ আট ॥

ততক্ষণে আর এক ঝাঁক এসে নামল সচ্চিদানন্দবাবুর আলো-ছায়া ও মৌসুমী ফুল ছড়ানো সুন্দর সবুজ লনে। হুঁ, তপতীর কলেজের অধ্যাপকের দল আর তাঁদের পত্নীরা। পুরুষদের পোশাকের রকমফের নেই। সেই ঢিলে হাতার পাঞ্জাবি ধুতি চাদর পাম্পশু। তরুণ অধ্যাপক প্রবীণ অধ্যাপক। কাঁচা চুল পাকা চুল। বিনীত নম্র হাসি, মার্জিত শান্ত ভঙ্গি। কে ফিজিক্স পড়ান, কে লজিক পড়ান জানা না থাকলে, চেহারা দেখে বলা শক্ত। কিন্তু এঁরা অধ্যাপক চোখ বুজে আপনি বলে দিতে পারেন। যেন একটা বিশেষ জাত, একটা বিশেষ শ্রেণী। ছোট-করে-চুল-ছাঁটা মাথা, নাকি তাঁদের লম্বা ঝুলের ঢিলে-ঢালা পাঞ্জাবি দেখে তা মনে হয় কে জানে। নাকি সতেরো জনের মধ্যে পনেরো জনের মুখে বর্মা-চুরুট দেখে? আর সাহিত্য-বাসরে যদি অধ্যাপকের দল আসেন তো আপনি জানবেন এঁদের প্রত্যেকের পকেটে কাগজ আছে—হুঁ, প্রবন্ধ। গল্প কবিতা? কক্ষনো না। অধ্যাপক যদি কবিতা লিখতেও পারেন, সাহিত্য-সভায় কোনদিন তিনি কবিতা পড়বেন না। গল্প-লেখক অধ্যাপক মাসিকে সাপ্তাহিকে গল্প পাঠান হয়তো, কিন্তু সাহিত্য-বাসরে গল্প লিখে আনবেন এমন কাঁচা তিনি নন। কেন তা কে জানে! যত বড় রসিক হোন তিনি, সভা-সমিতির নাম শুনলে কেমন যেন কটমটে শক্ত হয়ে ওঠেন। ছাত্র পড়ান বলে? ছাত্রের সামনে কবিতার গল্প-উপন্যাসের রস ঢালতে আপত্তি—নাকি ছাত্রদের অভিভাবকরাও সভা-সমিতিতে উপস্থিত থাকেন, থাকতে পারেন সেই আশঙ্কা?

আবার আসরে এসে চুপ করে থেকে শুধু গল্প কবিতা পাঠ কি আলোচনা শুনে গুটিগুটি বাড়ি ফিরে যাওয়ার ছেলেও কেউ নয়। না, এ যুগে সবাই সুধাবিন্দু নয়, সবাই ডক্টর নাগ নয়। আরথ্রাইটিস রুগী অধ্যাপক সুধাবিন্দু সাহিত্য-সভায় এসে চুপ-চাপ বসে থাকেন, বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টর নাগ প্রবন্ধ লেখা দূরে থাক, বাংলায় একটা চিঠিও কোনদিন লেখেন নি—এ-দৃষ্টান্ত অধ্যাপক-মহলে এখন হাজারে একটিও মেলে কি না বলা শক্ত। কাজেই যখনই তাঁরা সভায় অনুষ্ঠানে আসেন, পকেটে নির্ঘাত একটি করে কাগজ নিয়ে আসেন। আপনি কল্পনা করতে পারবেন না কোন্ অধ্যাপকের পকেট থেকে কোন্ বিষয়ের ওপর লেখা প্রবন্ধ বেরোবে। দর্শনের অধ্যাপককে শুনবেন 'আলালী ভাষা'র ওপর লেখা প্রবন্ধ পড়ছেন, লজিকের প্রফেসার The democratisation of culture-এর বাংলা 'কৃষ্টির গণরূপায়ণ' করে ছ'পাতার এক গুরুগম্ভীর আলোচনা লিখে এনেছেন ; ইতিহাসের অধ্যাপক মোটেই ইতিহাস আলোচনা করছেন না, Radio-active isotopes-এর 'তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক' বাংলা করে বাংলায় সরস প্রবন্ধ লিখে এনেছেন, এবং তাই তিনি গম্ভীর গলায় আসরে পড়তে আরম্ভ করেছেন। হ্যাঁ, এটাও সাহিত্যের অঙ্গ—বৈজ্ঞানিক তথ্য এখানে বড় কথা নয়, এতগুলি পরিভাষা চয়ন করে সেগুলি জায়গামত সাজিয়ে তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ওপর যে একটা বাংলা প্রবন্ধ রচনা করতে পারেন এবং এভাবে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই লিখে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব এই প্রবন্ধ তার নিদর্শন। সুতরাং সাহিত্যের আসরে এর মূল্য স্বীকার করতেই হয়। তেমনি আপনাকে অবাক করে দিতে কেমিস্ট্রির প্রোফেসার পকেট থেকে কাগজ বার করে পড়তে আরম্ভ করবেন প্রাচীন বাংলার শিল্পকীর্তির ওপর লেখা এক মনোজ্ঞ রচনা। তার অর্থ তিনি শুধু অধ্যাপক নন, কলেজে একটা

বিশেষ 'সাবজেক্ট' পড়াতে হয় বলে যে চব্বিশ ঘণ্টা তিনি তাই নিয়ে আছেন তা নয়, তাঁর একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা আছে, অন্য রকম পছন্দ অপছন্দ আছে। 'বিষ্ণুপুরের কুটির-শিল্প' প্রবন্ধ তার প্রমাণ। কেবল ছাত্র পড়ান ছাড়াও যে তিনি লেখার চর্চা রাখেন—সরস প্রবন্ধটি শোনার পর আপনার কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না। এবং এ থেকে আপনি এ-ও অনুমান করতে পারেন যে, দরকার হলে তিনি গল্প-কবিতা, এমন কি উপন্যাসও লিখতে পারেন; হয়তো লেখেনও, হয়তো আগে লিখতেন এখন বন্ধ করে দিয়েছেন; মোটের ওপর মৌলিক কিছু রচনা করার শক্তি তিনি রাখেন। তবে—আপনি তখন চিন্তা করবেন, তবে ছোটখাটো একটা গল্প বা কবিতা লিখে এনে তিনি এমন চমৎকার সাহিত্য-আসরে পড়লেন না কেন? উত্তরটা আপনি তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর এবং তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা থেকে জেনে নিন। কবিতা গল্প বা উপন্যাসের মত হালকা জিনিসে দেশ ছেয়ে গেছে। এখন এসব যত কম সৃষ্টি হয়, কম পড়া হয় তত মঙ্গল। 'Useful' অর্থাৎ 'দরকারী' বিষয় নিয়ে তিনি যদি আলোচনা না করেন, তবে আর করবেন কে—কারা? তাঁরা, বুদ্ধিজীবীরা অন্তত এদিক থেকে সমাজের রাশ টেনে ধরেছেন—সস্তা গল্প-উপন্যাসের বেনো-জলে আপনাদের ভেসে যেতে দিতে তাঁরা রাজী নন।

পার্ক স্ট্রীটের 'গ্রীষ্ম-বাসরে' নিমন্ত্রিত অধ্যাপক-গিন্নীরা কিন্তু অন্যরকম। তাঁদের স্বামীদের বেশভূষা ও চালচলনের মধ্যে যে য়ুনিফর্মিটি চোখে পড়ে, গৃহিণীদের বেলায় তা একেবারে অনুপস্থিত। তাঁদের শাড়ির রঙ, ব্লাউজের ছাঁট, খোঁপার প্যাটার্ন, চশমা, জুতো, এমন কি হাতের বটুয়াটিও একজনের সঙ্গে আর একজনের মেলে না। তেমনি হাসি, কথা, রুচি এবং দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে তাঁরা প্রত্যেকেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেন। অন্তত যতক্ষণ তাঁরা এরকম একটা জ্ঞানী গুণী ও শিল্পী সমাবেশে,

উপস্থিত থাকেন ততক্ষণ তো বটেই। স্বামীদের মতন তাঁরা এক-রঙ এক-চেহারা নিয়ে মিশে যেতে রাজী নন। মিশে থাকা মানে হারিয়ে যাওয়া। যেমন আকাশের ছায়াপথ। একত্র দলা পাকিয়ে থাকলে নক্ষত্রদের কেউ চিনতে পারে, বুঝতে পারে? বনানী দেবী তা চান না, রুচি দেবী তা চান না, রেবা দেবী তা চান না—অপর্ণা, ইন্দিরা, তৃপ্তি, মীরা সকলেই ছায়াপথের তারকাদের মত হারিয়ে যাবার ভয়ে নিজের মনোমত শাড়ি ব্লাউজ খোঁপা হাসি ও কথার বৈশিষ্ট্য ও বর্ণচ্ছটা দিয়ে নিজেকে উজ্জ্বল উচ্ছল রাখতে চাইছেন। তাঁরা এত বেশি উজ্জ্বল ও বর্ণাঢ্য, চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত যে প্রত্যেকটি মুখ আপনার চোখে পড়বে, প্রত্যেকের কথা হাসির রেশ আপনার কানে আসবে।

সচ্চিদানন্দবাবুর লনে নেমে চারজন, তরতর করে সিঁড়ি-বারান্দা পার হয়ে হল্-কামরায় ঢুকে পড়লেন, তিনজন উঠে গেলেন লাইব্রেরি-ঘরে, দুজন গিয়ে দাঁড়ালেন কড়িডরে, দুজন ওদিকে না গিয়ে লনের এধারে গোলাপ-বাগানের পাশে পামগাছের ঠাণ্ডা ছায়ায় এসে দাঁড়ান।

এখানে তরুণের দল। কথাশিল্পী অরুণকুমার, মোহন, চন্দ্রমাধব, শিতিকণ্ঠ, কবি জয়দ্রথ, রামবিজয়, নরহরি, শিবশংকর প্রভৃতি এবং তরুণ নাট্যকার কৃত্তিবাস। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা করছে।

বনানী ও রেবা অরুণকুমার ও রামবিজয়কে চেনেন। অন্যদের সঙ্গে পরিচয় নেই। অরুণ পরিচয় করিয়ে দেয়। ইনি কবি, ইনি নাট্যকার, ইনি গল্প-লেখক। আর ইনি আমাদের ইকনমিক্স-এর প্রোফেসার সোমের স্ত্রী মিসেস সোম—ইনি মিসেস শাস্ত্রী—সংস্কৃতের অধ্যাপক শাস্ত্রীর স্ত্রী।

পরিচিত হয়ে, পরিচয় পেয়ে অধ্যাপক-পত্নীরা সুখী হন, লাল পাতলা ঠোঁট ছড়িয়ে দুধ-রঙ দাঁত বের করে দুজন হাসেন। দুজনেরই বয়স অল্প।

'ভেতরে গেলে না?' বনানী প্রশ্ন করেন।

অরুণ মাথা নাড়ে।

'ভীষণ গরম, তা ছাড়া লাইব্রেরি-ঘরে হল্‌-ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে এলাম ভীষণ ভিড়, তা ছাড়া ওখানে সব ক'টা ফসিল জড়ো হয়েছে। আমাদের পোষায় না সেখানে।'

রেবা কিন্তু অবাক চোখে তখনও জয়দ্রথকে দেখছেন। কবি? বিখ্যাত আধুনিক কবি জয়দ্রথ চক্রবর্তী। ভায়লেট রঙের ট্রাউজার, সাদা লিনেনের হাওয়াই শার্ট, পায়ে ভারি-সোলের জুতো, আর চোখে অবিশ্বাস্য-রকম মোটা ফ্রেমের চশমা। মাথার অনেকখানি জুড়ে ঘাড় চাঁছা হয়েছে। সিগারেট টানছে। হাতে একটা চামড়ার ফোলিও-ব্যাগ। পরিচয় না পেলে রেবা মনে করতে পারতেন, বুঝি কোনও বিলেতী মার্চেন্ট-অফিসের চাকুরে। নাকি ছেলেটি মার্চেন্ট-অফিসেও চাকুরি করে আবার এদিকে কবিতাও লেখে? চিন্তা করতে করতে মিসেস শাস্ত্রী হাতের কচিপাতা-রঙ রুমাল দিয়ে ঘাড় মুছলেন গলা মুছলেন। ভীষণ ঘামছিলেন তিনি। সত্যি বলতে কি, রেবা একটু একটু কবিতা লিখতে অভ্যাস করছেন। কবি জয়দ্রথের দেখা পেয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে ভীষণ ছটফট করছিলেন। সুবিধা হল না, কেননা, অরুণ তার বন্ধু গল্পলেখক শিতিকণ্ঠের সঙ্গে কথা বলছে। যেন উত্তেজিত হয়ে গেছে দুজন—যেন এর আগেই উত্তেজিত হয়ে ছিল তারা কার সঙ্গে কথা বলে। তারই জের চলছে কি।

'আমরা নরকের কীট, আমরা কেবল সমাজের অন্ধকার পচা-গলা দুর্গন্ধ খুঁজে বেড়াই, আমাদের সাহিত্যে মহৎ আদর্শ বলতে কিছু নেই!'

'নীলাদ্রি-ব্যোমকেশের দলকে বলে দাও ওদের ভালোমানুষী সাহিত্যের দিন শেষ হয়েছে। সমাজ এখন অনেক বেশি জটিল, অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষের মন, এখন আর আগের সরলতা নিয়ে—'

শিতিকণ্ঠকে বাধা দিয়ে চন্দ্রমাধব নামক ছেলেটি বলল, 'কেবল আদর্শ আর আদর্শ। নীতিকথা আর উপদেশ। গল্প-উপন্যাস না লিখে কথামালার মত বই লিখলেই হয়?'

'না না', অরুণ গম্ভীরভাবে এবার মাথা নাড়ল। 'এরা এটা বোঝে না, এদের মাথায় এটা আসছে না যে, আধুনিক গল্পলেখক যখন একটি আধুনিক মানুষের চরিত্র সৃষ্টি করে তখন তার মনের জটিল গ্রন্থিগুলি—যদি সে সত্যিকারের শিল্পী হয়, উন্মোচন করবেই।

'নিশ্চয়ই। না হলে আর ক্রিটিসিজম-অব-লাইফ কথাটা আসে কেন।' শিতিকণ্ঠ ঘাড় কাত করে।

চন্দ্রমাধব হেসে বলল, 'আমরা এই সমাজকে, আধুনিক স্ত্রী-পুরুষকে গল্পে উপন্যাসে দেখাব। এগজিবিট করা আমাদের কাজ। প্রীচ করবার দায় অন্য লোকের। গৌতম বুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধী অনেকেই অনেক হিতোপদেশ দিয়ে গেছেন এদেশে।'

'হুঁ, তাইতো এখন বিলেতী নেকেড-পিকচার এলে, কি চৌরঙ্গির হোটেলে ময়দানে স্কার্ট তুলে সাগরপারের উর্বশীর দল নাচতে এসেছে শুনলে মানুষ ক্ষেপা কুকুরের মতন টিকিট কাটতে ছোটে। আগে এরকম ছিল না।'

'ব্যোমকেশদের বলে দেওয়া উচিত এদেশের এত এত মহাপুরুষের মহৎ বাণী, দার্শনিক বুলি ধোপে টিকল না।'

'কি।' অরুণ ভুরু কুঁচকে বলল, 'ব্যোমকেশ-নীলাদ্রি স্রেফ বলে বসবে আধুনিক সাহিত্য এর জন্যে দায়ী।'

শিতিকণ্ঠ হাসল। 'বটে, সব নষ্টামি আমাদের ঘাড়ে চাপালে তো চলবে না; যদি আধুনিক সাহিত্য পড়ে সত্যিই দেশের মেয়ে ও ছেলের দল উচ্ছৃঙ্খল হচ্ছে, খারাপ হচ্ছে বলে নীলাদ্রী-ব্যোমকেশের দল দাবী করে তো আমি বলব, এই খারাপ হওয়াটা শুরু হয়েছে 'নষ্টনীড়' 'ঘরে বাইরে'র আমল থেকে।'

'না হে, তা বলতে পার না।' চন্দ্রমাধব বলল, 'তাই হবে চিন্তা করে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ কবিগুরু ভূমার কথা নিয়ে অসীমের কথা নিয়ে লাখ দু'লাখ আধ্যাত্মিক কবিতা লিখে গেছেন।'

চন্দ্রমাধবের কথা শুনে তরুণের দল হেসে উঠল। রেবা ও বনানীও হাসলেন।

চন্দ্রমাধব বলে চলল, 'রেডিও খুললেই তো কেবল শোনা যায়ঃ প্রভু ক্ষমা কর—অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতম হে—কিন্তু এত শোনার পরও দেশের দুর্নীতি, সমাজের নোংরামি কমল ? কাজেই সাহিত্য পড়িয়ে, সাহিত্য শুনিয়ে যদি দেশকে গুড-বয় করা যেত তো অনেকদিন আগেই তা করা যেত।'

'থাক, ওদের কথা নিয়ে আপনারা মাথা ঘামাবেন না।' বনানী এবার সরাসরি শিতিকণ্ঠের দিকে তাকান। 'আপনাদের গল্প-উপন্যাসের ওরা যত খুশি নিন্দা করুক, কিন্তু মনে রাখবেন, আপনাদের পাঠক-পাঠিকা দেশে ক্রমেই বাড়ছে।'

অরুণ হাসল।

'তা জানি, আধুনিক গল্প উপন্যাস পড়তে আপনি যে ভীষণ ভালবাসেন তা সেদিন কলেজ-লাইব্রেরিতে মিঃ সোমকে দেখে—মানে তাঁর চামড়ার ব্যাগটা দেখে বুঝলাম—আধুনিক লেখকদের বইয়ে ঠাসা।'

বনানী সুন্দর করে অরুণের দিকে তাকালেন।

'আর এর জন্যে কি সোম মহাশয় কম বিরক্ত হন— বলেন যে, আমি চিনির বলদ, কেবল বোঝা বয়ে বেড়ানো কাজ—একবার নিয়ে এসো আবার ফিরিয়ে দাও—হি-হি।'

'তা তিনি এক-আধখানা পড়লেই পারেন।' চন্দ্রমাধব ফোড়ন কাটল। 'চিনির স্বাদ নিতে মানা করছে কে মিঃ সোমকে ?'

বনানী মাথা নাড়লেন।

'ওঁর সময় নেই, নোট লিখে একফোঁটা সময় পান না—তো আপনাদের গল্প উপন্যাস পড়েন কখন।'

যেন কথাটা শুনে অরুণ ও চন্দ্রমাধব একটু মর্মাহত হল, যেন কথাশিল্পীরা হঠাৎ চুপ করে গেল বলে কবি জয়দ্রথ মুখ খোলার সুযোগ পেল।

'সেদিন প্রভুদয়ালের সঙ্গে দেখা এক পাবলিশারের দোকানে। আমায় দেখেই ও বক্তৃতা করতে আরম্ভ করল—কি, না আমাদের কবিতার মাথামুণ্ড নেই, অর্থহীন কতকগুলো শব্দ সাজিয়ে, কেবল আঙ্গিক আর ভঙ্গির প্যাঁচ কষে কবিতা-পাঠকদের চোখ ধাঁধানো কাজ—এগুলো কোনদিন কবিতা বলে স্বীকৃতি পাবে না।'

কবি নরহরি হাসল।

'বেশ তো, যারা আমাদের কবিতা বোঝে তারাই পড়বে—প্রভুদয়ালের কবিতার পাঠক দেশে এখনও অনেক বেশী অস্বীকার করি নে, হুঁ, স্কুলের ছেলেদের পাঠ্য-বইয়ে সে-সব কবিতার ছড়াছড়ি—'

'সে-কথাই বলছিল প্রভুদয়াল গর্ব করে : আমরা লোকশিক্ষা, দেশের সংস্কৃতি, সমাজের কল্যাণের কথা মনে রেখে কবিতা লিখি, তাই সে-সব কবিতা সার্থক হয়—তোমাদের মত কলম ধরেই স্বাধিকারপ্রমত্ত হতে শিখি নি ;—প্রভুদয়ালের আর এক বন্ধু, হুঁ, তিনিও কবি, কি যেন নাম, আমায় ঠাট্টা করে বলছিলেন : গোলাপ আর চাঁদের নরম মুখ নিয়ে যখন তোমরা আধুনিক কবিরা কবিতা লিখতে, সেগুলো কিছু কিছু বুঝতাম, কাস্তে হাতুড়ি নিয়ে কবিতা লিখতে তাও কিছু কিছু বোঝা গেছে, কিন্তু "ঘুমের মত নাম মনে পড়ে রাত্রির প্রগাঢ় রৌদ্রে" পড়লে মনে হয় প্রলাপ শুনছি।'

'বেশ তো, আষাঢ় মাসে চাষা পান খায়, কি, পাখি সব করে রব তোমরা লিখে যাও না, লোকে পড়ে বুঝবে, শিখবে,—আধুনিক কবি—'

'কী দরকার ওদের সঙ্গে তর্ক করে—ইডিয়টগুলোকে কি তুমি বলে বোঝাতে পারবে আধুনিক কবি ইস্কুলের পড়ুয়াদের নীতিবোধ

জাগ্রত করতে কবিতা লেখে না, কবি তার আত্মবিশ্লেষণের মর্জিতে কবিতা লেখে।'

রেবা, হাঁ করে তাকিয়ে জয়দ্রথের কথা শুনছিলেন। তরুণ কবির দল 'ইনট্যুইশন', 'উপলব্ধি', 'চৈতন্য', 'সুররিয়ালিজম', 'প্রতীকী' 'রিল্কে', 'এলুয়ার্ড', 'এলিয়ট', 'জীবনানন্দ', 'অ্যাড্‌মনিশন্‌স্ অব নেচার', 'পোয়েটিক সিম্বল্‌স্', প্রভৃতি নানা ইংরেজী বাংলা শব্দ, কথা ও নাম জুড়ে জুড়ে আলোচনায় মেতে উঠল। কিন্তু সে-সব একটুও বুঝতে চেষ্টা না করে রেবা অবাক হয়ে ভাবছিলেন প্রভুদয়ালের মত সব কবিই লম্বা চুল রাখবে, লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি গায়ে পরবে —কিন্তু—রেবার একবার মনে হল, ট্রাউজার হাওয়াই-শার্ট চাঁছা-ঘাড় নিয়ে মোটা ফ্রেমের চশমা চোখে এই ছেলেটি মেডিকেল স্টুডেণ্টই হয়তো হবে। রেবা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন একটু ফাঁক পেলেই কবিকে জিজ্ঞাসা করবেন, রেবা স্থির করে ফেললেন জয়দ্রথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না হওয়া পর্যন্ত তাঁর আধুনিক কবিতা লেখা কোনকালে হবে না--হতে পারে না। একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেললেন মিসেস শাস্ত্রী। ছোট্ট রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন।

॥ নয় ॥

স্বর্ণচাঁপা গাছ। কিন্তু ফুল সুন্দর কি পাতা সুন্দর। সোনা-রঙ চাঁপা-ফুল, চাঁপা-কলির দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়ায়। সবুজ নধর পাতাগুলিও তো কম সুন্দর নয়। ফাল্গুনে কুঁড়ি ছিল, চৈত্রে কিশলয় হল, আর বৈশাখ পড়তে যৌবনপুষ্ট হয়ে প্রত্যেকটা পাতা আকাশের নীল ছুঁয়ে দেখতে আকুল হয়ে উঠেছে। অনন্তের তৃষ্ণা? অনন্ত-সৌন্দর্যের পিপাসা?

তপতী ছাদের পাশের চাঁপাগাছের বর্ণনা লিখছিল। সুপুরীগাছ কেটে স্বর্ণচাঁপা গাছ বসিয়েছে ও। কেননা তার লেখার টেবিলের ওধারে জানলার বাইরে চাঁপাগাছটাই তো এখন চোখে পড়ছে। হুঁ, তার গল্পের নায়িকা রুনি ফুলের আগুন আর পাতার সবুজ দেখতে-দেখতে ভাবছে—কেবল কি মানুষ, গাছের ফুলটি পাতাটিও আলোর দিকে আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে এক দুর্নিবার পিপাসায় ক্ষণে ক্ষণে অস্থির চঞ্চল হয়ে ওঠে। মাটির বন্ধন ছেড়ে ছুটে যেতে চায়। কিন্তু পারে কি? পারে না। সহস্রবাহু শিকড়ের শিকলে আটকা পড়ে ফুলের দল পাতার দল কাঁদছে, কাঁপছে। দক্ষিণের দমকা হাওয়ায় গাছের সেই কান্নার সুর, পিপাসার দীর্ঘ-নিশ্বাসই তো থেকে থেকে ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু মানুষ পারে, রুনি পারে বন্ধন ছিঁড়ে বাঞ্ছিতের কাছে ছুটে যেতে। চাঁপার আগুনের চেয়েও দ্যুতিময়, সবুজ নধর পাতার চেয়েও লাবণ্যময় একুশ বছরের এক নগ্ন পুরুষদেহের আশ্চর্য ঐশ্বর্যের এ কী দুর্নিবার আকর্ষণ! রুনির চোখ বার বার ফিরে যাচ্ছে সেদিকে। নিজেকে শাসন করতে গিয়ে—

'তপতী—'

'মা।'

তপতী ঘুরে বসল। বিভাবতী ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢোকেন।

'এখনও শেষ হল না তোর?'

'শেষটাই যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে, মা।' অসহায় চোখে মেয়ে মার মুখ দেখে।

'আশ্চর্য!' বিভাবতী হাতের ঘড়ি দেখলেন। 'সবাই এসে গেছেন, সব এসে গেল। আর তো পনেরো মিনিটও সময় নেই। উনি আমাকে কেবল তাড়া দিচ্ছেন। কিন্তু তোর যে এখনও লেখা চলছে—'

'কী করব, শেষটা কিছুতেই ঠিক করতে পারছি না!' তপতী হাতের কলমের ওপর চোখ রাখল। 'সকলের মন রাখতে গেলে গল্পের কিছুই থাকছে না, কিছুই দেখানো হয় না যে।'

'কিন্তু তাই তো তোমায় করতে হবে—যাতে ব্যোমকেশবাবুরাও গল্পটা শুনে খুশি হন, আবার অরুণদের কাছেও ভালো লাগে।'

তপতী চুপ।

'চুপ করে রইলি কেন। এদিকে তোর চুলবাঁধা হয় নি। বাথরুমে গিয়ে মুখটুখটা সাবান দিয়ে ধুয়ে আয়—তোর শাড়ি ব্লাউজ আমি বের করে রেখেছি।'

তপতী তথাপি নীরব।

বিভাবতী রুষ্ট হন।

'সকালে জয়তীর কাছে বললি গল্প নাকি রাত্রেই লেখা শেষ হয়ে গেছে—অথচ—আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না।'

'না, হয় নি।' তপতী মাথা নাড়ল।

'কেন?'

'সকালে কেটে অন্যরকম করে লিখলাম।'

'তারপর?' বিভাবতী ভুরু কুঁচকান। 'তো এখন আবার কি হচ্ছে।'

'আবার অন্যরকম করতে হচ্ছে।' তপতী মার দিকে তাকাতে ভয় পেল। 'শেষটা কিছুতেই—'

'আশ্চর্য!' বিভাবতীর ঠোঁট-জোড়া ঈষৎ নড়ে উঠল। 'এরকম হচ্ছে কেন?'

হাতের কলম রেখে দিয়ে তপতী ছ'হাতে মুখ ঢাকল। বিভাবতী মেয়ের মাথায় হাত রাখেন।

'তাহলে কখন তুই লেখা শেষ করবি—ওদিকে যে—'

'আমি পারব না মা—এবার আমার গল্প-পড়া হবে না।'

'হবে না মানে?' মেয়ের মাথা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বিভাবতী কঠিন হয়ে ওঠেন। 'গল্প মানে কি—একটা কিছু লিখে দশজনের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো—খুব একটা সাংঘাতিক জিনিস তৈরী করতে হবে না তোমাকে। যেমনটি হয়েছে ওতেই চলবে। তুমি মুখ হাত ধুয়ে এসো। ওঠ—'

কাঁদতে লাগল তপতী।

বিভাবতী কেমন একটু বিমূঢ় হতে গিয়ে সামলে নেন।

'কি নিয়ে গল্প লেখা হচ্ছে শুনি?'

'একটি মেয়ের ভালবাসা।'

'সেবার তোমার "দৃষ্টি" গল্প তো তাই নিয়ে ছিল, কেমন না?'

কথা না কয়ে তপতী ঘাড় কাত করল।

বিভাবতী হালকা নিশ্বাস ফেললেন।

'তবে আর কি, সেবার তো ব্যোমকেশবাবুর দল, অরুণের দল ছপক্ষই প্রশংসা করলেন তোর গল্পের।'

যেন কান্নার বেগ রুখতে তপতী ঢোক গিলল।

'কিন্তু এবারের ভালবাসা যে অন্যরকম, মা?'

'অন্যরকমটা কি!' বিভাবতী ধমকে উঠলেন। 'ভালবাসা—ভালবাসা। এ নিয়ে অত মাথা ঘামানো কেন শুনি?'

চোখ থেকে হাত সরিয়ে তপতী মাকে দেখে।

'সকলের ভালবাসা কি একরকম থাকে মা? সব ভালবাসার দৃষ্টি কি এক হতে পারে—' অসহায় অস্ফুট গলায় তপতী বলতে চাইছিল, বিভাবতী বাধা দিলেন।

'সবাই—পুরনো নতুন—সকল মানুষ যে-ভালবাসা মেনে নেবে সেই ছবি আঁকবে--তুমি অন্যরকম করতে যাবে কোন্ সাহসে।'

তপতী আবার হাত দিয়ে মুখ ঢাকল।

বিভাবতী ঘুরে দাঁড়ান।

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে লিখে শেষ করো। করে, হাত মুখ ধুয়ে কাপড় পরে নাও—আমি আর অন্য কথা শুনতে চাই নে।'

বিভাবতী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে তপতী টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কাঁদতে লাগল।

॥ দশ ॥

'আর দশ মিনিট—না আট মিনিট বাকি পাঁচটার। আপনারা উঠুন। হল্‌-ঘরে চলে আসুন।' বিনীত হেসে সচ্চিদানন্দবাবু ওপরের লাইব্রেরি-ঘরে অভ্যাগতদের তাড়া দিয়ে গেলেন। করিডরে দাঁড়ানো চার-পাঁচটি ছেলে ও মেয়েকে তাড়া দিয়ে বিভাবতী লনের পামগাছের ছায়ায় দাঁড়ানো অরুণ-শিতিকণ্ঠের দলকে হাত তুলে ডাকলেন। 'তোমরা এস, এসে বসে পড়, এখুনি মিটিং আরম্ভ হবে।' শিতিকণ্ঠরা বিনীত হেসে ঘাড় কাত করল। 'যাচ্ছি—আমরা ঠিক গিয়ে আসরে বসব। আমাদের এখানকার আলোচনা এখনি শেষ হবে।' প্রীত হয়ে বিভাবতী তেতলার বারান্দায় আবার কারা দাঁড়িয়ে গল্প করছেন তাঁদের ডাকতে সেখানে ছোটেন। সেখানেও জোর আলোচনা চলছে। সেখানে নাট্যকার কৃত্তিবাসকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে আটটি তরুণী। ইঞ্জিনিয়ার সোমের দু-মেয়ে, জাস্টিস রাধারমণের স্ত্রী, অ্যাডভোকেট নন্দীর মেয়েরা এবং আরও কে কে। তৈলহীন লালচে ফাঁপানো চুল দুলিয়ে হাত নেড়ে কৃত্তিবাস মস্কোর বলশয় থিয়েটারের অধুনিকতম স্টেজের বর্ণনা করছেঃ 'সেখানে ইলেকট্রিক ইলেক-ট্রনিকের দৌলতে ওরা স্টেজের ওপর পাহাড় জঙ্গল, এমন কি বন্যার তাণ্ডব পর্যন্ত দেখাতে পারছে। আর আমরা কোথায় পড়ে আছি!' তরুণীর দল লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলে মস্কো-ফেরত তরুণ নাট্যকার কৃত্তিবাসের সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে হাঁ করে তার কথা গিলছে। বস্তুত তাদের চেহারা দেখলে মনে হয় মস্কোর বলশয় থিয়েটারের বন্যার দৃশ্য না দেখলেও কিছু আফসোস নেই, তারা যে কৃত্তিবাসের সামনে দাঁড়িয়ে তার কথা শুনতে পারছে এতেই তৃপ্ত, এতেই সব ক'টি তরুণী সুখী। না হলে, নিচে হল্‌-ঘরে ব্যোমকেশদের সঙ্গে বসে

প্রবীণ নাট্যকার অনঙ্গ চৌধুরী প্রাচীন ভারতীয় নাটক ও গ্রীক নাটকের রূপ ও রসের মধ্যে এতটা পার্থক্য ছিল কেন বোঝাতে গিয়ে যখন কথা বলছিলেন, তখন তাঁর শ্রোতা একমাত্র সংস্কৃতের অধ্যাপক শাস্ত্রীমশাই ছাড়া আর কেউ ছিল না। কোন মেয়ে তো নয়ই। দুই নাট্যকারের বক্তৃতার শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে এমন আকাশ-পাতাল ব্যবধান কেন, বোধকরি বিভাবতীর তলিয়ে দেখার সময় ছিল না। তাই তিনি কৃত্তিবাস ও তরুণীদের আসরে যেতে বিনীত একটা তাড়া দিয়ে অন্যদিকে সরে গেলেন। অন্যদিক মানে দোতলার বারান্দায় যেখানে অধুনা-লুপ্ত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'কশাঘাত'-এর সম্পাদক কমল মুখুয্যে অধ্যাপক গাঙ্গুলীর সঙ্গে প্রগাঢ় সাহিত্যালোচনায় মেতে উঠেছেন। 'বুঝলেন মশাই, টাকার অভাবে কাগজটা চালাতে পারলাম না, না হলে দেখিয়ে দিতাম বাংলাদেশে সাহিত্যের নামে আজ যে রাশি রাশি জঞ্জাল জড়ো হচ্ছে সে-সব কী করে ঝেঁটিয়ে রাতারাতি বিদায় করতে হয়।' অধ্যাপক গাঙ্গুলী কেবল ঠোঁট টিপে হাসেন, কথা বলেন না। বোধকরি তিনি 'কশাঘাত'-সম্পাদক মুখুয্যের কোটরগত চক্ষু, শিরাবহুল মুখাবয়ব এবং সাংঘাতিক উঁচু নাক (অনেকটা 'যুগসন্ধি'-সম্পাদক ভূমেন্দ্রনারায়ণের নাকের সঙ্গে মিল আছে) দেখে বুঝতে পেরেছেন, সুযোগ পেলে আধুনিক সাহিত্যকে চাবুক মারতে ঝাঁটা মারতে এর জুড়ি নেই। শীর্ণ মুখটা বিকৃত করে কমল মুখুয্যে বলছিলেন ঃ 'আধুনিক সাহিত্য ! মশাই কী সব অশ্লীল লেখা এরা লিখতে পারে আপনি ধারণা করতে পারবেন না। আপনি পারবেন না এদের কারোর লেখা একখানা বই বাড়িতে নিয়ে যেতে, সেখানে আপনার স্ত্রী আছেন, পুত্রকন্যা আছে। আমি সেদিন এক পাবলিশারের দোকানে বসে একটা বই পড়ে ফেললাম। তারপর নমস্কার করে ওখানে বইটি রেখে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর মশাই রাস্তার কোনও মেয়েছেলের দিকে তাকাতে আমার নিজেরই যেন কেমন লজ্জা করছিল।'

মুখুয্যের কথা শুনে অপর অধ্যাপক চক্রবর্তী হাসলেন : 'তবে বইটা পড়ে শেষ করলেন দোকানে দাঁড়িয়ে! শেষ পর্যন্ত এগোতে পেরেছিলেন ?'

'নেহাত কিউরিয়সিটি হল মশাই তাই পড়লাম, ছি-ছি ছি—আমার তো মনে হয় এসব বই দোকান থেকে টেনে বার করে ফুট-পাথের ওপর জনসাধারণের চোখের সামনে পুড়িয়ে ফেলা উচিত।'

'আপনি কিন্তু ব্যোমকেশ গাঙ্গুলীদের বইও অশ্লীল বলতেন। যখন তারা তরুণ ছিল। তাদের এক-একটা বই বেরিয়েছে আর আপনার সাপ্তাহিক কাগজে গালিগালাজের তুবড়ি-বাজি ছুটেছে।'

চক্রবর্তীর কথা শুনে মুখুয্যে হঠাৎ থতিয়ে গেলেন, কেননা এখন তিনি ব্যোমকেশ গাঙ্গুলীর একজন পরমভক্ত পাঠক এবং ব্যোমকেশ গাঙ্গুলীর সুপারিশে তিনি ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ির সাহিত্য-মজলিসে উপস্থিত থাকার নিমন্ত্রণ পেয়েছেন। 'নিরপেক্ষ সমালোচক', একদিন সচ্চিদানন্দবাবুকে কথায় কথায় ব্যোমকেশ গাঙ্গুলী জানিয়ে রেখেছিলেন, 'আপনার বাড়ির সাহিত্য-সভাগুলিতে ওকেও ডাকবেন। প্রকৃত রসজ্ঞ, অথচ চোখ-কান বেশ খোলা রেখে সাহিত্যের বিচার করতে জানে' ইত্যাদি।

'তরুণ বয়সে ব্যোমকেশের বইয়ে আদিরস একটু-আধটু ছিল বইকি।' কমল মুখুয্যে নিজেকে সামলে নিয়ে অধ্যাপক চক্রবর্তীর কথার উত্তর দিলেন। 'কিন্তু, সেখানে সৌন্দর্যটা ছিল বড় কথা—মা-কালীও তো উলঙ্গ, কিন্তু আপনি কি সেই মূর্তিকে অশ্লীল বলতে পারেন ? পারেন না। কেননা মহামায়ার রূপ সব উলঙ্গতা সব অশ্লীলতাকে ছাপিয়ে যায় সেখানে। তাই বলছিলাম, মশাই, জয়দেব বিদ্যাপতিও অশ্লীলতা করে গেছেন সাহিত্যে—কিন্তু আজ যা চলেছে বাংলা গল্প উপন্যাসে!' কোটরগত চোখদুটো বুজে কমল মুখুয্যে প্রচণ্ড বেগে মাথাটা নাড়লেন, মাথার যন্ত্রণা হলে লোকে যেমন করে, তারপর চোখ খুলে চক্রবর্তীর দিকে তাকালেন : 'মর্বিড, মর্বিড মশাই,

দুষ্ট গন্ধ আর বিষাক্ত ক্ষত ছাড়া আপনি সো-কল্ড্ মডার্ন-লেখকদের বইয়ে আর কিছু পাবেন না—কে এক দিকপাল সাহিত্যিক উদয়নাগ গজিয়েছে মশাই—তারই শিষ্য হয়েছে এখনকার সব তরুণ লেখক—পচা ঘা সব সময়ই সংক্রামক জানেন তো ?'

'হ্যাঁ, উদয়নাগের নাম শুনেছি, সাংঘাতিক সাংঘাতিক সব গল্প-উপন্যাস লিখছে, আপনার সঙ্গে পরিচয় আছে ?' এবার অধ্যাপক গাঙ্গুলী প্রশ্ন করতে কমল মুখুয্যে আগের চেয়েও বেশি জোরে মাথা নাড়লেন : 'ন্‌নাঃ, এসব লেখকের সঙ্গে পরিচয় হবার আগে আমার যেন মৃত্যু হয়। শুনেছি লোকটা নাকি সারাদিন মদ খায় আর বেশ্যাবাড়ি পড়ে থাকে।'

অধ্যাপক চক্রবর্তী এবার শব্দ করে হাসলেন।

'তোমার সম্পর্কেও বাজারে একটা বদনাম আছে কিন্তু মুখুয্যে।' মুখুয্যে লাফিয়ে উঠলেন।

'আমার সম্পর্কে ? আমি মদ খাই, আমি ব্রথেলে পড়ে থাকি ?'

'ছি ছি, তা হবে কেন !' চক্রবর্তী জিভ কামড়ান, তারপর অল্প হেসে আড়চোখে অধ্যাপক গাঙ্গুলীকে একবার দেখে নিয়ে পরে কমলের দিকে তাকান : 'লোকে বলে তুমিও নাকি কবে গল্প-উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলে, কিন্তু সুবিধা করতে পার নি ! তারপরই তুমি সমসাময়িক লেখকদের লেখার কেবল সমালোচনা নয়, ঝেড়ে গালি-গালাজ শুরু করলে। আগে করেছিলে ব্যোমকেশদের, এখন করছ উদয়নাগ এবং পাঁচটি তরুণ লেখকের লেখার—মানে, নিজে যা পার নি, অন্যদের তা করতে দেখে ঈর্ষায় রাগে—'

'বটে, বটে—আপনাদের বক্তব্য আমি বেশ বুঝতে পারছি, মানে' —হঠাৎ থেমে যান লুপ্ত-'কশাঘাত'-সম্পাদক। রাগে ক্ষীণ দেহটা থরথর করে কাঁপে। এবং বোধকরি সেই মুহূর্তে সেখানে সচ্চিদানন্দ-বাবু ও বিভাবতীকে দেখতে পেয়ে কমল চিৎকার করে উঠলেন : 'শুনেছেন, শুনুন শুনুন, একজন ইউনিভার্সিটির প্রোফেসারের রায়—

হুঁ, বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ চরম রায় ; উদয়নাগদের লেখা আর 'তরঙ্গিণী' পদক দিয়ে দেশের জ্ঞানীরা যে ব্যোমকেশ গাঙ্গুলীকে সেদিন সম্মান জানাল—তাঁর লেখা এক পর্যায়ের এক এক স্তরের—আমি কেবল বায়াসড্ হয়ে, ঈর্ষান্বিত হয়ে নাকি তরুণদের —ক্ষমা করুন সচ্চিদানন্দবাবু, আমি চললাম, আমি থাকব না এখানে, যেখানে মুড়ি-মিছরির এক দর, যে আসরে—' যেন মুখুয্যে তৎক্ষণাৎ সিঁড়ির দিকে ঘুরে দাঁড়াতেন, হেসে সচ্চিদানন্দবাবু তার হাত ধরলেন—'না না, প্রোফেসার চক্রবর্তী আপনাকে ঠাট্টা করছিলেন—এ কখনও হয় ? এখনকার জীবিত লেখকদের মধ্যে ব্যোমকেশ গাঙ্গুলী অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক—তাঁর সঙ্গে কি—'

সচ্চিদানন্দবাবু হাসলেন, কিন্তু বিভাবতী গম্ভীর।

'উদয়নাগের মত লেখকের কোন লেখা আমার বাড়ির সাহিত্যের আসরে পড়া হবে না কমলবাবু, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। অধ্যাপক চক্রবর্তী নিশ্চয় ঠাট্টা করে—হয়তো আপনাকে চটাবার জন্যই—' বিভাবতী আড়চোখে দুজন অধ্যাপককে দেখলেন। যেন হঠাৎ লজ্জা পেয়ে অধ্যাপক চক্রবর্তী অন্যদিকে ঘাড় ফেরান এবং তাঁর হয়ে বিনীত হেসে অধ্যাপক গাঙ্গুলী বললেন, 'তাই—অমনি ঠাট্টা করা হচ্ছিল কমল মুখুয্যেকে, আধুনিকদের ওপর ও হাড়ে হাড়ে চটা, তাই ওকে চটাবার জন্য প্রোফেসার চক্রবর্তী এসব বলছিলেন।'

এবার কমল মুখুয্যের রাগ কমল। বিভাবতীর সঙ্গে তিনি আগে আগে হাঁটেন।

প্রোফেসার গাঙ্গুলী ও প্রোফেসার চক্রবর্তী সচ্চিদানন্দবাবুর সঙ্গে তাঁর হল্-কামরার দিকে এগোন।

স্থির হয়ে একজায়গায় বসতে, এমনকি দাঁড়াতেও পারছিলেন না একজন। চামেলী। প্রথম ছাপার অক্ষরে লেখা বেরোনোর এই এক অসুবিধা। তার চোখে আধুনিক প্রবীণ সমান। সকলের

লেখাই তার প্রিয়, সকলকেই সমান শ্রদ্ধা ও ঈর্ষার চোখে দেখে সে। যেমন চামেলী দেখছিলেন। তাই সকল লেখক-লেখিকার সঙ্গেই পরিচয় করতে তিনি ছটফট করছিলেন, চঞ্চল হয়ে ঘুরছিলেন। ব্যোমকেশ-নীলাদ্রিদের কাছে কিছুক্ষণ থেকে ছুটে গেছেন অরুণ-শীতিকণ্ঠ-জয়দ্রথদের কাছে, গেছেন তরুণ নাট্যকার কৃত্তিবাসের কাছে, পরক্ষণে ছুটে এসেছেন প্রবীণ নাট্যকার অনঙ্গ চৌধুরীর কাছে। কিন্তু বিশেষ ফল হয় নি—ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত কেবল একটি গল্প বা কবিতার সার্টিফিকেট নিয়ে কোন লেখক-লেখিকা, নামী লেখক-লেখিকা দূরে থাক, একাধিক লেখা এ-কাগজে, সে-কাগজে ছাপা হয়ে বেরিয়েছে এমন লেখক-লেখিকাদের কাছেও আমল পায় না। চামেলী পান নি। যেন তাই মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে যখন লাইব্রেরি-ঘরে উপবিষ্ট স্বামী ডক্টর নাগের কাছে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ 'মহিলা-প্রতিভা' কাগজের সম্পাদিকা হেমপ্রভাকে পেয়ে গেলেন। মোটা মানুষ হেমপ্রভা। ভীষণ ঘামছিলেন। যেন গরমের জন্য তিনি ছটফট করে এদিক ওদিক ঘুরছিলেন আর রুমাল চেপে চেপে গলার গালের ঘাম মুছছিলেন। তাঁর গায়ের ব্লাউজ অত্যন্ত পাতলা, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘামে সবটা ভিজে গিয়ে নিচের গোলাপী বডিজ সবটুকু রঙ ও রেখা নিয়ে ফুটে বেরিয়েছে। 'কোথায় চললেন ?' হেসে চামেলী আগে কথা বলেন।

'কে ভাই তুমি ?' মোটা ঘাড় ফেরাতে কষ্ট হচ্ছিল হেমপ্রভার, তাই চট্ করে সিঁড়ির পাশে দাঁড়ানো চামেলীকে দেখতে পান নি, পরে তিনি সম্পূর্ণ ঘুরে মিসেস নাগকে দেখে হাসেনঃ 'ও, তুমি! এস ভাই—ওপরে যাচ্ছ ? আমিও যাব, এখুনি মিটিং আরম্ভ হবে, তা হোক, একটু নিরিবিলি বসতে না পেরে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে—উঃ, এই প্রচণ্ড গরমে সভা-টভা ভাল লাগে না।'

'হ্যাঁ, আমিও ওপরে যাচ্ছি। চলুন, ডক্টর নাগ সেখানে বসে আছেন, আপনার সঙ্গে পরিচয় হলে উনি খুশি হবেন।' একটু চুপ

থাকার পর চামেলী বললেন, 'আপনার কাগজের খুব প্রশংসা করেন তিনি।'

'আমার কাগজ! আমার কাগজ ডক্টর নাগ পেলেন কোথায়? তিনি কি মহিলা-প্রতিভায় লেখেন?' যেন আকাশ থেকে পড়লেন হেমপ্রভা। চামেলীও অপ্রস্তুত হয়ে যান। বস্তুত তিনি ভাবছিলেন হেমপ্রভা তাঁকে একনজর দেখেই চিনে ফেলেছেন ঃ সেদিন 'জন্মদিন' নামে চামেলী নাগের যে লেখাটি বেরিয়েছে, এ সেই চামেলী নাগ। কিন্তু তা তো নয়। একটু আমতা-আমতা করে পরে চামেলী বুদ্ধি করে বললেন, 'বাঃ রে! আমার গল্প বেরোল আপনার মহিলা-প্রতিভায় আর সে-কাগজ আমার স্বামী—'

হাসলেন হেমপ্রভা।

'তাই বল, তুমি ভাই ডক্টর নাগের স্ত্রী। আমি ভাবছিলাম, তাঁর ছাত্রী-টাত্রী বুঝি। বেশ বেশ।'

খুশি হয়ে চামেলীও হাসেন।

'আমি ভাবছিলাম কি, আমি যে 'জন্মদিন'-এর লেখিকা সেটাই বুঝি আপনি ভুলে গেছেন।'

হেমপ্রভা মাথা নাড়েন।

'পাগল, তা ভোলার উপায় কি, ওই গল্পের জন্যে কি তুমি একদিন আমার কাগজের অফিসে গেছ, অন্তত সাত আট দিন গেছ, তাই না? ওই চেহারা ভোলা যায় কখনও?'

কথাটা শুনে চামেলী খুব বেশি প্রীত হন না—তা না হলেও আজকের এই সাহিত্য-আসরে এসে সম্পাদিকার সঙ্গে একটু ভাল করে পরিচয় হল এবং স্বামীর সঙ্গে এঁর পরিচয় করিয়ে দিতে পারছেন চিন্তা করে চামেলী ভিতরে ভিতরে গর্ব অনুভব করছিলেন। অবশ্য ওপরে উঠে লাইব্রেরি-ঘরে ঢুকে চামেলীর মনের সে-ভাব থাকে না। কেননা পরিচয় পর্বের সময় হেমপ্রভা মাত্র একবার একটু হেসে নবারুণকে দেখে সেই-যে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে দৈত্যের মত

চেহারার পরাশর ডাক্তারের সঙ্গে আলাপে মেতে গেলেন—সে একটা দেখবার জিনিস। বস্তুত লাইব্রেরি-ঘরে তখন চারজন ছাড়া আর কোনও পুরুষ ছিলেন না। আরথ্রাইটিস রুগী ক্ষীণকায় অধ্যাপক সুধাবিন্দু, কালো বেঁটে ডক্টর নাগ, পরাশর ডাক্তার এবং প্রভুদয়ালের সেই বন্ধুটি ছাড়া বাকী সবাই সভাপতি ও প্রধান অতিথিকে দেখতে অথবা সম্বর্ধনা করতে অথবা পরিচিত হতে নিচে নেমে গেছেন। সুধাবিন্দু নির্বিকার—তেমনি ডক্টর নাগ। পরাশর অবশ্য দু-বার নিচে নেমে গেছেন এবং এইমাত্র আবার ফিরে এসেছেন, তার কারণ প্রভুদয়ালের সেই গেরুয়া-ফতুয়া-পরা বন্ধুটি। তিনি যে ভাল হাত দেখতে পারেন, কি করে তা এখানে জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর সকলের আগে পরাশর হাত দেখিয়েছেন, তারপর দেখিয়েছেন সুধাবিন্দু, এবং বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত থাকার পর এখন বৈজ্ঞানিক ডক্টর নাগ নিজের হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে প্রভুদয়াল বসু-মল্লিকের গেরুয়া-ফতুয়া-পরা বন্ধুর মুখের দিকে কাতরচোখে তাকিয়ে আছেন। সেই অবস্থায় হেমপ্রভাকে নিয়ে চামেলী ঘরে ঢোকেন।

নবারুণের প্রসারিত ডান হাতের রেখার ওপর দৃষ্টি ন্যস্ত করে বসু-মল্লিকের বন্ধু গুরুগম্ভীর গলায় বলছিলেন: 'দশমভাবে বুধ ও বৃহস্পতির অবস্থানের অর্থ, বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য প্রকাশের দ্বারা জাতক জীবনে প্রভূত কৃতিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হবে এবং—'

স্বামীর কৃতিত্ব অর্জনের সম্ভাবনার কথায় চামেলীর মোটেই কান ছিল না। তিনি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছিলেন 'মহিলা-প্রতিভা'-সম্পাদিকা হেমপ্রভাকে এবং সাহিত্যসেবী পরাশর ডাক্তারকে। না, সাহিত্য নিয়ে তাঁরা কথা বলছেন না। হেমপ্রভা ডাক্তারের এত বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছেন, মনে হবে দুজনের শরীরে এখনি ঠোকাঠুকি লাগবে। 'না, প্রায় একমাস পর দেখলাম

আপনাকে, চেহারা ভাল হয়েছে—কিছু ভয় নেই, যথেষ্ট ইমপ্রুভ করেছে শরীর।'

বস্তুত হেমপ্রভা কবে রোগা ছিলেন চামেলী মনে করতে পারছিলেন না। আজ দু মাস ধরে মহিলা-প্রতিভা সাপ্তাহিক কাগজের অফিসে তাঁর যাওয়া-আসা। দু মাস আগেও হেমপ্রভা এরকম সাংঘাতিক মোটা ছিলেন।

পরাশরের কথায় হেমপ্রভা হাসলেন।

'আপনি কোনদিনই আমার চেহারা খারাপ দেখছেন না—আমি বলব, ডাক্তার হলেও এটা আপনার একটা রোগ—হি—হি।'

'মোটেই না।' পরাশর মাথা নাড়েন। 'আপনার গালের রঙ বেশ লাল হয়েছে। আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন না পরিচিত যদি কেউ এখানে থাকেন। মানে, যাঁরা ক'দিন আগেও আপনাকে দেখেছেন!'

যেন এবার রীতিমত লালাভ হয়ে হেমপ্রভা ঘাড় ঘুরিয়ে এঁকে ওঁকে দেখেন। মহিলার সঙ্গে চোখোচোখি হতে আরথ্রাইটিস রুগী সুধাবিন্দু অন্যদিকে মুখ ফেরান। নবারুণ এবং পামিস্ট নবারুণের হাত নিয়ে ব্যস্ত। দুজনের এদিকে দৃষ্টি ছিল না। হেমপ্রভা চামেলীকে দেখার প্রয়োজন বোধ করেন না। বরং ডাক্তারের শরীরের সঙ্গে আর একটু বেশি ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে চোখের ইশারা করতে ডাক্তার একটু সামনের দিকে ঝুঁকে নুয়ে দাঁড়ান। হেমপ্রভা এবার ডাক্তারের কানে কানে ফিসফিস করে কি বলতে, বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে ডাক্তার হাসেন: 'হুঁ হুঁ, বুঝেছি—ওই-যে বলেছিলাম, পিটুটারি গ্ল্যাণ্ড-এর কাজ ওটা—বলেছিলাম কিনা?'

হেমপ্রভা আবার ফিসফিস করে কি বললেন।

পরাশর ডাক্তার মাথা নাড়েন।

'বুঝেছি বুঝেছি, ফলিকিল্ স্টিমুলেটিং হরমোন্।'

হেমপ্রভা আবার ফিসফিস করেন।

পরাশর এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে শব্দ করে হাসেন : 'লাম্বো-সেক্রাল্ রিজিয়নের ব্যাপার ওটা।'

চামেলী হাঁ করে তাকিয়ে দুজনকে দেখলেন, শুনলেন। কিছু বুঝলেন কি ? কিছু বুঝতে তিনি চাইছিলেন না। তাঁর বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠল। তিনি আশা করেছিলেন তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পটা নিয়ে হেমপ্রভা নবারুণের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করবেন। আধুনিক ছোটগল্পের রূপ ও ধারা সম্পর্কে চামেলীকে হয়তো দু-একটা উপদেশও দিতে পারেন। কিন্তু সে-সব কিছুই হল না। যেন সাহিত্য-বাসরে এসে হেমপ্রভা এতক্ষণ ছটফট করে ঘোরাঘুরি করছিলেন পরাশর ডাক্তারকে খুঁজে বার করতে। এখন পেয়ে যেতে, হরমোন্ আর গ্ল্যাণ্ড সংক্রান্ত অত্যন্ত গোপন তত্ত্ব নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনায় মেতে গেলেন।

॥ এগারো ॥

বিভাবতীর রুচি আছে নিষ্ঠা আছে। ব্যোমকেশ চারদিকে তাকিয়ে হল্‌-ঘরের সাহিত্য-বাসর সাজানোর সুন্দর ও অভিনব ব্যবস্থাগুলি লক্ষ্য করে মুগ্ধ হয়ে গেছেন। যেন এখানে ভারতীয় ও চীনা সংস্কৃতি এসে হাত মিলিয়েছে। দেওয়ালের ছবি, এখানে ওখানে দাঁড় করানো পিতলের কলসীর ওপর গোঁজা ফুল ও পাতাবাহারের তোড়া, ফরাশের ওধারে লাল সিমেণ্টের ওপর নিপুণ হাতে আঁকা আলপনা-চিত্র, ধুপ ও দীপের মালা, সবুজ সাটিনে মোড়া নাতিবৃহৎ মঞ্চটি—প্রত্যেকটা আয়োজন চোখ ও মনকে জুড়িয়ে দেওয়ার মতন। 'আমাদের প্রাচ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির এটাই বৈশিষ্ট্য, অনাদি।' ব্যোমকেশ একসময় পাশে উপবিষ্ট অনাদিকে বলছিলেন : 'সর্বত্র একটা স্নিগ্ধ কল্যাণের রূপ—আশ্চর্য সংযম ও উদার সঙ্গতিবোধ এই সভ্যতাকে বেঁধে রেখেছে। আজকের এই অনুষ্ঠানের শান্ত-গম্ভীর পরিবেশ দেখে আমার বার বার তাই মনে পড়ছে। এই কথা দিয়ে আমি আমার ভাষণ আরম্ভ করব ইচ্ছা আছে। এখানে কোনরকম উচ্ছৃঙ্খলতা, কোনরকম চাঞ্চল্য—'

ব্যোমকেশের কথায় বাধা দিয়ে অনাদি বলছিলেন : 'স্পীচ খুব বেশি বড় না হয় খেয়াল রাখবেন, কালচার-টালচার সম্পর্কে যাহোক দু'কথা বলে সাহিত্য নিয়ে কিছু বলবেন, তবে খুব বেশি একটা কনজারভেটিভ টোন যেন বক্তৃতায় না থাকে। আপনার পাবলিসিটি হ্যাম্পার করবে। এখানে আধুনিক কাগজওয়ালারাও অনেকে আছেন।'

'তা আমি জানি, তা আমার খেয়াল আছে।' ঈষৎ হেসে ব্যোমকেশ উত্তর করেছিলেন এবং নীরব থেকে আসরে উপস্থিত

প্রত্যেকটি তরুণ-তরুণী, প্রবীণ-প্রবীণার মুখ-চোখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে বোধকরি ভাষণটা মনে মনে ঝালিয়ে নিচ্ছিলেন। কোনও সাহিত্য-বাসরে বাড়ি থেকে কিছু লিখে এনে পড়ার পক্ষপাতী তিনি নন। কারণ তার কয়েকটা অসুবিধা আছে। প্রথমত, এমনি কাগজে লিখে আনলে লোকের মনে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, তিনি এতবড় সাহিত্যিক, এত নামডাক আছে, পয়সা করেছেন— ভাষণটা ছাপিয়ে এনে এখানে ডিস্ট্রিবিউট করলেন না কেন। তিনি কি কৃপণ—নাকি বাইরে থেকে যতটা শোনা যায় আসলে—

অথচ এমন একটা সভা নয়, দুটো-তিনটে করে সাহিত্য-সভা সাহিত্য-বাসর রোজই শহরের এপাড়ায় ওপাড়ায় লেগে আছে এবং ব্যোমকেশকে শতকরা নব্বুইটায় সভাপতিত্ব করতে হচ্ছে। সুতরাং যদি প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটা ভাষণ ছাপাতে হয় তবে হিসাব করে দেখা গেছে মাসে প্রায় চার-পাঁচশো টাকা (বিশেষ, কাগজের এই দুর্মূল্যের বাজারে) বেরিয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, সময় ও অবস্থা বুঝে কথা বলা (বিশেষ আজ যখন চারিদিকে এমন হাজারটা মতবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে) ভালো। আসর বুঝে বক্তৃতা করা বুদ্ধিমানের কাজ। যেমন এইমাত্র অনাদি সাহা বলেছেন খুব বেশি কনজারভেটিভ মানে রক্ষণশীল মতবাদ থাকলে তাঁর বক্তৃতা কোনও কোনও কাগজ ছাপতে ইতস্তত করবে। তা ছাড়া এটা পার্ক-স্ট্রীট অঞ্চল। কমবেশি, একটা কসমোপলিটান পাড়া বলা চলে, এবং এসব অঞ্চলে আধুনিকতাটা একটু উগ্র হয়ে দেখা দিয়েছে। ব্যোমকেশ আগে বুঝতে পারেন নি, এখন আসরের চেহারা দেখে বুঝতে পারছেন। কাজেই যদি আগে থাকতে বেশ কড়া সুরে (মানে, যাকে বলে নীতিবোধের কড়া পাকে জ্বাল দিয়ে) বক্তব্য রচনা করে ছেপে আনতেন তো এখানে উপযুক্ত রিসেপ্শন পাওয়া তাঁর পক্ষে কষ্ট হত। কেবল গৃহস্বামী সচ্চিদানন্দবাবু এবং তাঁর গৃহিণী বিভাবতী

তো সব নন। তাঁদের সমাজ তাঁদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবর্গের কথা চিন্তা করতে হবে। কাজেই বক্তৃতা না ছেপে এনে বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে। তেমনি এর বিপরীত দিকটাও আছে—আজ যদি উত্তর কলিকাতার কোনও প্রাচীন বনেদী বংশের এক সাহিত্যামোদী ভদ্রলোকের গৃহে এরকম আসর ডাকা হত এবং ব্যোমকেশকে সেখানে সভাপতিত্ব করতে হত তো তিনি পরিবেশ এবং অবস্থা বুঝে ঠিক সেই অনুসারে বক্তৃতা করতেন—সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে সেভাবে আলোচনা করতেন—

ভাষণটা মনে মনে ঠিক করে ফেলার পর ব্যোমকেশ অপেক্ষাকৃত হালকা হয়ে আবার প্রভুদয়াল, নীলাদ্রি ও অনাদি প্রভৃতির সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু ভূমেন্দ্রনারায়ণ স্থির নেই। তিনি বিভাবতীর সঙ্গে সঙ্গে থেকে সব ক'টি মহিলা সব ক'টি তরুণীর সঙ্গে যাকে বলে যেচে গিয়ে পরিচিত হচ্ছেন পরিচয় নিচ্ছেন। এই বয়সেও অখণ্ড উৎসাহ মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করার। ব্যোমকেশ এটাই লক্ষ্য করছিলেন। নীলাদ্রিও অবশ্য আসন ছেড়ে বারকয়েক উঠে গেছে। কথাটা বেশ কিছুদিন থেকে ব্যোমকেশের কানে আসছে। মেয়েরা নীলাদ্রির বই পড়তে খুব ভালবাসেন। এবং এই কারণে নীলাদ্রির সঙ্গে তাঁদের পরিচয়ের যোগসূত্র ক্রমেই দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হচ্ছে। নীলাদ্রিকে আজ সব মেয়ে সব মহিলাই দেখতে চান। সকলেই তার সঙ্গে কথা বলতে উৎসুক। ব্যোমকেশ এই আসরে এসেও এটা লক্ষ্য করেছেন। এবং এর জন্য যে ঈর্ষার একটা সূক্ষ্ম কাঁটা তাঁর বুকে খচখচিয়ে না উঠতে পারত তা নয়—কিন্তু পরক্ষণেই একটা কথা চিন্তা করে ব্যোমকেশ শান্ত হয়ে গেছেন। নীলাদ্রিকে তিনি স্নেহ করেন ভালবাসেন, কিন্তু এটা সত্য, নীলাদ্রির লেখা ভয়ঙ্কর সেন্টিমেণ্টাল—সুতরাং মেয়েরাই তার লেখা বেশি পছন্দ করবেন। ব্যোমকেশ অতটা সেন্টিমেণ্টাল হতে পারেন না—বক্তব্যের মধ্যে যদি বুদ্ধির চিন্তার খোরাক না থাকল, ভাববার কথা

না থাকল তো সেই গল্প-উপন্যাসের পরমায়ু ক'দিন? সাহিত্যকে কালজয়ী হতে হলে অবশ্যই তাতে চিন্তার খোরাক—

ভূমেন্দ্র এসে আসন নিলেন। হাতঘড়ি দেখলেন। ব্যোমকেশের কানে কানে বললেন, অর্কোলোজিস্ট প্রতুল সরকারে মেয়ে ওটি। নাম হেনা। ওপেনিং-সঙ গাইবে। তুমি কি রেডিওতে ওর গান শোন নি?'

'হ্যাঁ, শুনেছি।' ব্যোমকেশ ঘাড় কাত করলেন, করতে হল, কিন্তু ভূমেন্দ্রর দিকে বা যে-মেয়েটি গান করতে অর্গানের সামনে দাঁড়াল তার দিকে তাকালেন না। প্রভুদয়াল ও অনাদি এই আসরের জন্য গুটিকয়েক রিজলিউশনের খসড়া তৈরি করছেন। সবই অবশ্য সাহিত্য সম্পর্কে, সাহিত্যের শুচিতা এবং শালীনতা রক্ষা করা যায় কিভাবে সে-সব নিয়ে। যেমন প্রথম প্রস্তাবের খসড়া দাঁড়িয়েছে: শহরের কোনও পাবলিক লাইব্রেরি (প্রাইভেট লাইব্রেরি সম্পর্কে পরে বিবেচনা করা হবে) এবং স্কুল ও কলেজের লাইব্রেরিগুলিতে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট কোনও বই না রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয়েছে: সাহিত্যের শ্লীলতা-অশ্লীলতার কোনও সঠিক মানদণ্ড নেই, অন্তত এদেশের জনসাধারণ তার মানদণ্ড স্থির করার মত বুদ্ধি, বিবেচনা ও শিক্ষা রাখে না। এদেশের মাত্র শতকরা সাড়ে বারোজন 'শিক্ষিত' অর্থে শিক্ষিত সুতরাং যেখানে এত বেশি অজ্ঞতা ও মূর্খতা সেখানে সরকারের বিবেচনার উপর দেশবাসীকে নির্ভর করতে হয়, সুতরাং এই সভা সরকারকে, সেন্সার-বোর্ড যেভাবে দেশীয় ফিল্ম অর্থাৎ চলচ্চিত্র সেন্সার করছেন সেভাবে, সাহিত্য সম্পর্কে সজাগ থেকে বাংলা সাহিত্যের শালীনতা ও শুচিতা রক্ষা করার জন্য অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থাবলম্বন করতে অনুরোধ জানাচ্ছে। তৃতীয় প্রস্তাবে বলা হয়েছে: সাহিত্যের নাম ভাঙিয়ে দেশে প্রতিদিন নূতন নূতন সিনেমা-কাগজ বেরোচ্ছে—এসব কাগজ পত্র-পত্রিকা কুরুচিপূর্ণ ও

কামোদ্দীপক ছবিতে ভরা থাকে—আগে এসমস্ত পত্র-পত্রিকার প্রচার একটা বিশেষ শ্রেণীর লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ; কিন্তু এখন শিক্ষিত সম্প্রদায়, বিশেষ করে স্কুল ও কলেজের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে, এমন কি তাদের অভিভাবক-অভিভাবিকাদের মধ্যেও প্রচার বৃদ্ধির জন্য কাগজওয়ালারা নূতন কৌশলের আশ্রয় অর্থাৎ দেশের সাহিত্যিকদের লেখা ছাপবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে এবং অধিকাংশ সিনেমা-পত্রিকায় একদিকে দেশের বিশিষ্ট লেখকদের লেখা ও অন্যদিকে কুরুচিপূর্ণ আপত্তিকর ছবিতে পূর্ণ হয়ে সমাজের উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত সকল গৃহে অবাধ প্রবেশাধিকার লাভ করছে। এই সম্পর্কে দেশের সাহিত্যিকদের সতর্ক হওয়া উচিত। সুতরাং এই সভা অনুরোধ জানাচ্ছে, ভবিষ্যতে কোনও সাহিত্যিক যেন (উচ্চ পারিশ্রমিকের বিনিময়েও) এই সমস্ত পত্র-পত্রিকায়—

ব্যোমকেশ এখানে বাধা দিলেন। নীলাদ্রিও আপত্তি জানাল।

তৃতীয় প্রস্তাবের খসড়া প্রভুদয়াল বসু-মল্লিক এবং অনাদির। কেননা প্রভুদয়াল বসু-মল্লিক তাঁর কোনও কবিতা বা প্রবন্ধ আজ পর্যন্ত সিনেমা-কাগজে ছাপতে দেন নি। ওরা চায় নি বা তিনি দেন নি বলা শক্ত। এবং অনাদি সাহার গল্প বা উপন্যাসও কোনও সিনেমা-কাগজে ছাপা হতে এখনও দেখা যায় নি। ব্যোমকেশবাবু এবার পূজায় এই শ্রেণীর একটা কাগজে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস দিয়েছেন, নীলাদ্রি তিনটা কাগজে গল্প দিয়েছে। ব্যোমকেশ বললেন, 'এটা তোমাদের ভুল ধারণা—সিনেমা-কাগজে লেখা বেরলে সাহিত্যিকের মর্যাদা কমে না, বরং সেই কাগজের মর্যাদা বাড়ে। কাগজ জাতে ওঠে। আর আমাদের লেখা ছেপে যদি এরা জাতে উঠতে চায় তো তাতে বাধা দেওয়া ঠিক নয়। এদিক দিয়ে আমাদের লিবারেল হতে হবে। কেননা তারা বুঝতে পারছে কেবল বোম্বাই-স্টুডিওর চুটকি খবর পড়ে আর অভিনেতা-অভিনেত্রীর মুখ দেখে এখন দেশের পাঠক-সাধারণ তৃপ্ত নয়, তারা সৎ-সাহিত্য পড়তে চায়—কাজেই একদিন—

একদিন কেন, এখনি দেখা যাচ্ছে ছবির সংখ্যা কমতে আরম্ভ করেছে এবং তেমন আপত্তিকর ভঙ্গিতে তোলা কোনও তারকার ছবি প্রায় ছাপাই হচ্ছে না।—'কী বলো নীলাদ্রি?' নীলাদ্রি তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করল। 'হ্যাঁ, এখন এরা অনেকটা সংযত হয়ে গেছে, দেখছে যে, কাগজকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে সস্তা লেখা, সস্তা ছবি ছাপা বন্ধ করতে হবে, তাইতো আমিও –'

'না না, ও প্রস্তাব কেটে দাও, তার চেয়ে বরং লেখক ও পাবলিশারের মধ্যে বর্তমানে যে একট স্ট্রেণ্ড সম্পর্ক চলেছে এটা যাতে দূর হয় সেই বিষয়ে কি করা যায় তার ওপর স্ট্রং একটা রিজলিউশন –'

অনাদি তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে রাজী হল।

বসু-মল্লিক আর একলা করেন কি—অগত্যা সিনেমা-পত্রিকা সংক্রান্ত প্রস্তাবের খসড়া কেটে বাদ দেওয়া হল।

প্রতুল সরকারের মেয়ে হেনা তখন গলা খুলে উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইছে: হে ক্ষণিকের অতিথি, এলে প্রভাতে…

তখন অবশ্য বিকেল, বৈশাখের অস্তসূর্যের রক্ত আভা সচ্চিদানন্দ-বাবুর লনে বাগানে বারান্দায় ব্যালকনিতে মধুর অবসাদের মতন ছড়িয়ে আছে। হলঘরের 'গ্রীষ্ম-বাসর' সুন্দরভাবে জমে উঠেছে। না এখন আর কেউ বাইরে দাঁড়িয়ে নেই, ওপরের লাইব্রেরি-ঘরটাও ফাঁকা। আরথ্রাইটিস-রুগী সুধাবিন্দু, ডক্টর নাগ, বসু-মল্লিকের গেরুয়া-ফতুয়াপরা পামিস্ট বন্ধু, চামেলী, পরাশর ডাক্তার এবং হেমপ্রভা এসে গেছেন আসরে। তরুণের দল ওদিকে, প্রবীণের দল এদিকে—মেয়েরা মঞ্চের সামনে। পশ্চিমের করিডর দিয়ে বিভাবতী তপতীকে সঙ্গে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। তপতীর পরনে জাম-রং শাড়ি, মাথার পিছনে একটা সাদা রিবন বাঁধা, বাকি চুলটা পিঠে ছড়িয়ে আছে। হঠাৎ ভূমেন্দ্রনারায়ণ ব্যোমকেশের কানের কাছে মুখ সরিয়ে আনলেন: 'ছোট মেয়ে, কিন্তু মার মতন চেহারা পায় নি।'

ব্যোমকেশ নিরুত্তর।

ভূমেন্দ্র ফিসফিসিয়ে বললেন, 'তুমি কি বড়টিকে দেখেছ—বিভাবতীর বড় মেয়েকে?'

বিরক্ত হয়ে ব্যোমকেশ মাথা নাড়লেন। মুখটা আরও কাছে সরিয়ে এনে ভূমেন্দ্র বললেন, 'এসেছে, এখন এখানেই মানে বাড়িতেই আছে বাবা-মার কাছে। এ-মেয়ের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর ওই মেয়ে। অবিকল বিভার মুখ পেয়েছে। শুনলাম—আসর সাজানো, ওদিকে নিমন্ত্রিতদের জন্য মিষ্টিটিষ্টির তদারক করা, সব বড় মেয়ে করেছে, করছে। এসব বিষয়ে ভারি তুখোড় নাকি, বিভা বলছিল।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, পরে ডেকে আলাপ করা যাবে, এখন চুপ কর, মিটিং আরম্ভ হয়েছে।' রুষ্ট গলায় ব্যোমকেশকে শেষ পর্যন্ত বলতেই হয়। এরকম একটি চঞ্চলচিত্ত পুরুষ কী করে এতবড় একটা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদনা করে এবং এই ধরনের সভা-সমিতিতেই বা মানুষ তাকে প্রধান অতিথি হিসাবে ডাকে কেন চিন্তা করে ব্যোমকেশ কোনও সদুত্তর পান না।

॥ বারো ॥

একটা বৈশাখী-চাঁপা নাকের কাছে তুলে শুঁকছিল জয়তী। তপতীর পড়ার ঘরে দাঁড়িয়ে ও। জানলার বাইরে বাগানের মুছে-যাওয়া রোদ দেখছে। নীচের ঠোঁটে একটা সূক্ষ্ম মোচড় লেগে আছে। তপতীকে যে শেষ পর্যন্ত জয়তী রাজী করাতে পারল। জয়তী-ই বোনকে কাপড় পড়িয়ে দিয়েছে, বেণী-টেনি বাঁধতে দিলে না, সময়ও ছিল না ; শেষটায় যাহোক করে একটা রিবন জড়িয়ে গেছে, তাতেও মন্দ দেখায় না তপতীর চুল। মা একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছিল। তপতীর গল্প শেষ হয় নি, ও নাকি কিছু পড়বে-টড়বে না—মার কাঁদো-কাঁদো চেহারা দেখে জয়তী ভাঁড়ার ফেলে ছুটে আসে ওপরে। তারপর বোনকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে লেখাটা কোনও রকমে শেষ করতে বলে। আগের মত করে, মানে রাত্রে যে-রকম বলেছিল ও, যদি সেভাবে গল্প শেষ করতে সাহস না পায় তবে মাঝামাঝি একটা জায়গায় গিয়ে শেষ করলেই তো আপদ চুকে যায়। তপতী বলেছিল, অরুণদের ভালো লাগবে না। জয়তী বলেছিল, খুব ভালো না লাগতে পারে, কিন্তু খারাপ লাগবে না ঠিক, তাছাড়া ব্যোমকেশবাবুর দল ভালো বলবে। তপতী সে-ভাবেই তাড়াতাড়ি লেখাটা শেষ করেছে। পাঁচ মিনিটও লাগে নি যদিও ওইটুকুন অন্যরম করে ঘুরিয়ে লিখতে। গল্পের শেষটা জয়তীকে দেখিয়ে গেছে ও ঃ সহস্রবাহু শিকড়ের শিকলে বাঁধা পড়ে চাঁপাফুলেরা কাঁদছে, পাতার দল কাঁদছে, কাঁপছে। দক্ষিণের দমকা হাওয়ায় গাছের সেই কান্নার সুর, পিপাসার দীর্ঘশ্বাসই তো থেকে-থেকে ছড়িয়ে পড়ছে। আলোর জন্য আকাশের জন্য অনন্তকাল ধরে এই হাহাকার। গাছেরা পারে না, কিন্তু মানুষ পারে, রুনি পারে বন্ধন

ছিঁড়ে বাঞ্ছিতের কাছে ছুটে যেতে। চাঁপার আগুনের চেয়েও দ্যুতিময়, সবুজ নধর পাতার চেয়েও লাবণ্যময় একুশবছরের এক নগ্ন পুরুষদেহের এ কী আশ্চর্য দুর্নিবার আকর্ষণ! রুনির চোখ বার বার ফিরে যাচ্ছিল সেদিকে, তার কোলের ওপর ধরে রাখা কবিতার খাতার একটা পাতা ওল্টানো হয় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রুনি নিজেকে, নিজের চোখকে শাসন করল, সংযত করল—রুনি বুঝতে পারল গাছ যদি আকাশের নীল ছুঁতে চেয়ে মাটির বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে তো ও শুকিয়ে যাবে মরে যাবে। একদিনের স্পর্শের তৃপ্তি তার চিরকালের স্বপ্ন দেখা, প্রতিদিন একটু একটু করে আলোর গান শোনা, আকাশের কবিতা পড়া ঘুচিয়ে দেবে। রুনি ভয় পেল। হয়তো গাছেরা এই জন্যই বুদ্ধিমান—হয়তো এই জন্য তারা সীমা ছাড়ে না, গণ্ডি অতিক্রম করে না। তারা দুঃখ পেতে চায় না। তবে রুনি কেন আর···। মাস্টারকে ডনকসরত করতে দিয়ে কবিতার খাতাটা হাতে করে ছাদের আলিসার কাছে চলে গেল ও—গিয়ে চাঁপাগাছটাকে দেখতে লাগল। তার চোখে জল এসে গেছে। দুঃখে নয়, ব্যর্থতায় নয়, সাফল্যের উচ্ছ্বাসে, গাছের কাছ থেকে একটা চরম সত্য শিখতে পারার অসহ্য সুখে ও কাঁদছিল। পুরুষদেহের পেশীর-ছন্দ রক্তের-দোলা যদি কবিতা হয়, তো সেই কবিতা সেই গান আমি চিরকাল তোমার মধ্যে শুনতে পাব পড়তে পাব, হ্যাঁ, দরকার হলে ছুঁতেও পাব—তোমার অসংখ্য আগুন-রঙ ফুলের হাসি আর রাশি-রাশি পাতার কাঁপন আমার যৌবনের সাথী হয়ে রইল, ওগো চাঁপাগাছ, আমি তোমায় নমস্কার করি।

গাছকে নমস্কার জানিয়ে রুনি আস্তে আস্তে ছাদ থেকে নেমে এল আর কোনওদিন ও মাস্টার-ছোকরার সামনে যায় নি, গেল না।

তপতী দিদির মুখ দেখছিল। পড়া শেষ করে জয়তী টেবিল থেকে মুখ তুলেছে। তপতী মৃদু হাসল।

'কেমন হল ?'

'মন্দ কি।'

'ব্যোমকেশবাবুরা ভালো বলবেন, অরুণরা নিন্দা করবে ?'

বোনের কথা শুনে জয়তী হেসেছে।

'কী করে জানব, হয়তো ভালো লাগতেও পারে।' জয়তী চট্ করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেছে, 'আর সময় নেই, ওপেনিং-সঙ হচ্ছে, শুনছিস ? তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নে।'

তপতীকে পাঠাতে পেরে জয়তী নিশ্চিন্ত হয়েছে। আর তপতী সেজেগুজে গল্পের পাণ্ডুলিপি নিয়ে বেরিয়ে যেতে জয়তীর ঠোঁটে সূক্ষ্ম হাসির রেখা দেখা দিয়েছে। সেই হাসি এখনও লেগে আছে। বোনের লেখার টেবিল থেকে চাঁপাফুলটা তুলে বার বার নাকের কাছে নিয়ে ভাবছিল, এটা মন্দ না, যৌবনের সাধ-আহ্লাদ রুনি একটা গাছ দেখে, গাছের ফুল-পাতা দেখে মেটাতে পারবে। অনেকদিন মেটাতে পারবে। যৌবন ফুরিয়ে রুনি যখন বুড়ি হবে তখনও। কেন না গাছের জীবনে সেদিনও বসন্ত আসবে, নতুন কুঁড়ি গজাবে, ফুল ফুটবে। রুনি বুদ্ধিমতী বইকি !

'কে ?'

'আমি।'

চমকে উঠল না জয়তী, সুন্দর করে হাসল। অরুণ হাসছে। সেই একমাথা কালো কোঁকড়া চুল, লম্বা ঝুলের আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে আধুনিক গল্প-লেখক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'অনেকক্ষণ এসেছ ?' জয়তী ঢোক গিলল।

'হ্যাঁ', অরুণ টেবিল ঘেঁষে দাঁড়ায়। 'তুমি দেখেছিলে ?'

'নীচে ভাঁড়ার-ঘরে ছিলাম, দেখলাম গোলাপ-ঝোপের ওপাশে দাঁড়িয়ে—সঙ্গে আরও চার-পাঁচটি ছেলে।'

অরুণ মাথা নাড়ল।

'জয়দ্রথ শিতিকণ্ঠ ওরা ছিল। আমার তরুণ সাহিত্যিক বন্ধুরা।'

যেন কি একটু ভাবল জয়তী।

'তা চলে এলে কেন? তোমাদের সাহিত্য-সভা তো আরম্ভ হয়ে গেছে।'

ক্ষীণ হাসল অরুণ।

'আমাদের সাহিত্য-সভা? বলো ব্যোমকেশ গাঙ্গুলী, প্রভুদয়াল বসু-মল্লিক এবং তাঁদের শিষ্যদের সাহিত্য-বাসর। আমাদের না, অন্ততঃ আমার ও আমাদের বন্ধুদের তো নয়ই। আমি কোনও লেখা এবার পড়ছি নে।'

'কেন?' জয়তীর ঠোঁটে আবার মোচড় ওঠে।

'এমনি, ভালো লাগে না, সেবার আমার গল্পের খুব নিন্দে হয়েছিল তোমাদের বাড়ির বসন্ত-বাসরে।' একটু থামল অরুণ, জয়তীর চোখের ভিতর তাকাল। 'কেমন আছ? পরশু তপতীর মুখে শুনলাম। তাই—'

'তাই—?' জয়তী অরুণের চোখের ভিতর দেখে।

'তোমাকে দেখতে এলাম।' অরুণ গম্ভীর হয়ে গেল।

জয়তী গম্ভীর হয়ে গেল। চোখ নামিয়ে হাতের চাঁপা দেখে। অরুণ হাত বাড়িয়ে ফুলটা ধরে। জয়তী ছেড়ে দেয়। অরুণ ফুলটা নাকের কাছে তুলে নেয়।

'কথা বলছ না কেন?'

'কি বলব বলো?' জয়তী চোখের পাতা তোলে। ছলছল চোখ। অরুণ একটা বড় ঢোক গিলল।

'মেনিঞ্জাইটিস হয়েছিল শুনলাম, তপতী বলছিল—'

'কার?' যেন চমকে উঠল জয়তী, পরে স্থির হয়ে গেল, আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। 'ওই হয়েছিল যেন, তারপর হার্টফেল—' জয়তী আর বলতে পারে না, অন্যদিকে মুখ ফেরায়।

'ক-বছর না বিয়ে হয়েছিল তোমাদের?' অস্ফুট অপরিচ্ছন্ন স্বর

অরুণের, জয়তীর সাদা শুকনো সিঁথিমূল, নিরাভরণ দুখানা হাত খুঁটিয়ে দেখছে সে। যেন টের পেয়ে জয়তী এদিকে তাকায়। ঠোঁটের কিনারে মলিন হাসি।

'তুমি ভুলে গেছ ?'

'না, তা নয়।' অরুণ মলিন হাসল, 'তিন বছর,—তাই না ?'

'দু-বছরের কিছু বেশি হবে।' জয়তী বলে দিল। জয়তী হাত বাড়াতে অরুণ চাঁপাটা ওর হাতে ছেড়ে দেয়। জয়তী ফুলটা নাকের কাছে নেয় না, এমনি ধরে রাখে।

যেন একটু বেশি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে অরুণ জয়তীর গলা চিবুক বুক কোমর হাত পা।

'তখন নীচের জানলায় একটা সাদা ঝলক আমি দেখলাম বটে, তোমার হাতে ছুরি ছিল ?'

জয়তী থুতনী নাড়ল। 'ফল কাটছিলাম।'

অরুণ একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল। হাসতে গিয়ে হাসতে পারল না, গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর : 'বলা ঠিক নয়, তাহলেও বলব, সাদা থান পরে তোমাকে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে।'

'যেমন ?' জয়তী ভুরু টান করল।

'যেন একটা বরফের ফুল।'

ক্ষীণ শব্দ করে জয়তী হাসল।

'বরফ-ই বটে, তাপ নেই, রক্ত নেই।'

অপ্রস্তুত হয় অরুণ।

'না, তা নয়, উপমাটা অবশ্য ঠিক হল না।'—অরুণ ভাবে। তারপর : 'মনে হয় শরতের একটা সাদা মেঘ আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।'

'একই কথা।' জয়তী গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। 'মেঘের মতন আমার শব্দ নেই, গন্ধ নেই, তাই না ?'

অপ্রস্তুত না, আহত হল অরুণ। জয়তীর হাত ধরল। 'আমি

ঠিক তা বলতে চাইছি না—কেন জানি তোমাকে আশ্চর্য সুন্দর লাগছে, আজ, এখন—যা কোনদিন—'

জয়ন্তী বাধা দেয়, দিয়ে আগের চেয়েও ভুরু দুটো বেশি টান করে ধরে : 'তা বলে আমাকে দেখে তো আর তোমার গল্প লিখতে ইচ্ছে হবে না, হয় নি।'

'হবে, হচ্ছে।' অরুণের স্বর কাঁপছিল, হাত কাঁপছিল। জয়ন্তী হাত ছাড়িয়ে নেয়। বোধকরি একটু সরেই দাঁড়ায়। হাতের ফুলটা টেবিলে রাখে। তপতীর রাইটিং-প্যাড, কলমটা জায়গামত গুছিয়ে রাখছে এমন একটা নীরব ব্যস্ততা।

'কি হল ?'

'কি ?' জয়ন্তী ঘাড় ফেরায়।

অরুণ অল্প অল্প হাসছে। 'বিশ্বাস করছ না, বললাম যে ?'

'তপতী শুনলে ভীষণ রাগ করবে।' জয়ন্তী আঁচল দিয়ে কপাল মুছল। 'এমনিতেই খুব ছটফট করছিল ও এসেই দেখা কর নি বলে, সাহিত্যিক বন্ধুদের নিয়ে লনে দাঁড়িয়ে আধঘণ্টার বেশি গল্প করে কাটালে!'

'তপতী বলছিল বুঝি ?'

জয়ন্তী থুতনি নাড়ল। 'আমিও তো দেখলাম, বললাম না ?'

অরুণ ঘাড় নাড়ল, জয়ন্তীর মাথার পিছনের জানলা দেখল। তারপর আবার জয়ন্তীর চোখের ওপর চোখ রেখে কেমন যেন নিষ্ঠুরের মত মাথা নাড়ল। 'আর যেন আমি ওর মধ্যে প্রেরণা পাই নে।'

'কেন ?' জয়ন্তীর দুচোখ ঝিকিয়ে উঠল। 'তপতীকে দেখে গল্প আসছে না ? লিখতে পারছ না আর!'

'না।'

'হঠাৎ ?'

'হঠাৎ নয়, কিছুদিন ধরে দেখছি, যেন ওর মধ্যে গল্পের কিছু নেই, তা ছাড়া ও নিজেও তার প্রমাণ দিচ্ছে'—অরুণ লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'গেলবার তোমাদের বাড়ির সাহিত্য-বাসরে এমন পান্‌সে একটা প্রেমের গল্প পড়ল ও যে—'

'ব্যোমকেশবাবুরা খুশি হয়েছেন, কেন, আধুনিক যারা তারাও নাকি তপতীর গল্পের প্রশংসা করেছিল ?'

'করতে পারে, কিন্তু আমি করি নি, আমি করি নে।' অরুণ কঠিন হয়ে মাথা নাড়ল।

'তবে তুমি—' যেন কী বলতে গিয়ে জয়তী থামে, মাথা গুঁজে টেবিল গুছায়, তারপর: 'এবারের লেখা ভালো হয়েছে, এবার তোমার ভালো লাগবে হয়তো।'

'জানি না, মনে হয় লাগবে না, না লাগাই স্বাভাবিক।' টেবিল ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল অরুণ। 'আমার এখন কেবলই মনে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট রেখা, একটা সীমার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তপতী, যার বাইরে পা বাড়াবার ক্ষমতা নেই ওর, ঈশ্বর দেয় নি তাকে সেই শক্তি। ওর গল্প এক জায়গায় ঘুরবে।'

'সকলকে একরকম শক্তি দেয় কি ঈশ্বর!' জয়তী বলতে চাইছিল, বলল না। অরুণ ঘুরে দাঁড়ায়। জয়তী তার হাতের ঘড়ি দেখল। 'তপতী বোধহয় এখন গল্প পড়বে, তুমি যাচ্ছ আসরে ?'

'হ্যাঁ,' অরুণ ঘাড় ফেরায়। 'তুমি যাবে না ? শুনবে না বোনের লেখা ?'

'আমি সাহিত্যের বুঝি কি ?' নিস্পৃহ উদাস গলায় জয়তী বলল, বলে অন্যদিকে চোখ ফেরাল।

'ক্ষতি নেই, জীবনকে বুঝলেই হল, আমার মনে হয়, তপতীর চেয়ে তুমি জীবনকে বেশি জেনেছ, জানছ।' চৌকাঠের বাইরে পা বাড়ায় অরুণ। 'তাইতো…'

ওর বাকী কথাটা বোঝা যায় না। জয়তীর ঠোঁটে কুটিল হাসির মোচড় দেখা দেয়। মুহূর্তের জন্য ওর নিশ্বাস দ্রুততর হয়।

অরুণ দেখল না, বুঝল না। নাকি আড়াই বছর পরে একটু সাবালক হয়ে অরুণ আজ সত্যি জয়তীকে চিনে গেল? 'এই অরুণ—' ডাকছিল জয়তী। অরুণ করিডরের ওপারে চলে গেছে।

তোমাকে আশ্চর্য সুন্দর লাগছে। একলা চুপ করে দাঁড়িয়ে শিহরণটা নতুন করে শরীর মন দিয়ে অনুভব করল ও। দু হাত ছড়িয়ে শরীরের আড়মোড়া ভাঙল, হাই তুলতে গিয়ে 'আঁ' শব্দ করে উঠল। দক্ষিণের হাওয়ার দোলায় বসন্তের অরণ্যে যেমন মর্মর ওঠে।

'কিন্তু—' বুকের ভিতর ধক্ করে উঠল জয়তীর। অবিচার করছে ও তপতীর ওপর? না তো। বরং জয়তী বাড়িয়ে বলেছে, তোমাকে না দেখে তপতী ছটফট করছিল এতক্ষণ। তপতী মোটেই ছটফট করছিল না। দু একবার প্রশ্ন করেছে বটে অরুণ এল কি না, কিন্তু সারাক্ষণই কি ও তার গল্পের কথা ভাবছিল না? বরং লেখাটা নিয়েই ওর যন্ত্রণা অস্থিরতার শেষ ছিল না। জয়তী নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের মনে হাসল। এখানেই জয়তীর সঙ্গে তপতীর পার্থক্য। জয়তী ভাবতেই পারে না একটি মানুষকে ভুলে থেকে তপতী তার গল্পের জন্য—লেখা ঠিকমতন হচ্ছে না বলে কাঁদতে পারে। জয়তী কী করত? লেখা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে অরুণের হাত ধরে বলতো, দরকার নেই আমার গল্প পড়ে, সাহিত্য-বাসর মাথায় থাকুক, চলো দুজনে হাত ধরাধরি করে কোথাও গিয়ে একটু বেড়াই, গল্প করি। তোমার চেয়ে তো আমার লেখা বড় নয়। তুমি আগে —লেখা পরে। বরং তুমিই সব—গল্প কবিতা লিখে কী হবে? আগে জীবন, তারপর সাহিত্য হল কি না হল বয়ে গেল। তপতী তা বোঝে না, বুঝল না। তোমায় দেখে আমি লেখার প্রেরণা পাই। একটা কথার কথা। আসলে তোমাকে আমার ভালো লাগে, তোমাকে ভালবাসি। সাহিত্য না করেও জয়তী সাহিত্যিক ছেলের মনের ছবিটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে—আজ? অনেকদিন আগেই দেখে নিয়েছে। আর তপতী দেখল ওকে সাহিত্যের পাতলা

মোড়কের ভিতর দিয়ে।' যেমন দোকানে ওরা মোড়কের মধ্যে গয়না সাজিয়ে রাখে। অথচ এই মোড়ক ছিঁড়ে অরুণকে যে একদিন বেরিয়ে আসতে হবে, জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস ফেলতে হবে তপতী তা ভুলে রইল। যদি ও ভুলে থাকে তো আমি কী করতে পারি।

কাজেই জয়তীর এতটুকু অনুশোচনা নেই।

কাজেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গুনগুনিয়ে গান গাইতে আরম্ভ করল ও, চিরুনি চালিয়ে চুলটা ঠিক করতে লেগে গেল। চুল ঠিক করা হয়ে গেলে তপতীর কাজলদানী থেকে একটুখানি কাজল তুলে সূক্ষ্ম আঁচড় দিয়ে তা দুই চোখে বুলিয়ে নিল। দরকার ছিল না যদিও, এমনি ওর চোখ উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন প্রখর সুন্দর। এখন আমার চোখ দেখে অরুণ কী বলত, ভাবল জয়তী, শাদা পোশাক দেখে তো বরফের ফুল বলে ফেলল, কাজল পরা চোখ দেখে কী বলবে? আগুনের হ্রদ? সাহিত্য না করেও উপমা-টুপমাগুলো জয়তীর মাঝে মাঝে এসে যায়। নিজের মনে হাসল ও। হেসে খুব আলতো করে মুখে পাউডার বুলোল। তপতীর মুখের চামড়া একটু পুরু একটু মোটা। বাবার চামড়ার ধরন পেয়েছে ও। জয়তীর চামড়া মার মতন। পাতলা স্বচ্ছ, আঙুরের খোসার মতো মসৃণ। যেন ভিতর দেখা যায়। ভিতর কি আর দেখা যায়' কারোর চামড়ার ভিতরের জিনিস দেখা যায় না। যদি দেখা যেত—

বুকের ভিতর হঠাৎ যেন কেমন করে ওঠে। এখনও মাঝে মাঝে তার এরকম হচ্ছে। একটা বিশ্রী গ্লানি অবসাদে দেহমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কিছু আর ভাল লাগে না তখন। এই অবস্থায় জয়তীর চুপচাপ বসে থেকে ঘরের দেয়ালে চোখ রেখে কেবল হাই তুলতে ইচ্ছা করে বা শুয়ে থাকতে। এই অবসাদের সৃষ্টি লক্ষ্ণৌর বাসায়, সমীর রায়ের ঘরে। কলকাতার উজ্জ্বলতার উচ্ছলতার সঙ্গে এই গ্লানি এই ক্লান্তি মোটেই খাপ খায় না। কিন্তু তা হলেও

তো জয়ন্তী এটা এড়াতে পারছে না, কদিন তো হয়ে গেল ও এখানে চলে এসেছে, বাবাকে দেখছে মাকে দেখছে, তপতী কাছে কাছে আছে সারাক্ষণ। অথচ তার চোখের সামনের আকাশ অন্ধকার হয়ে যায়, আলো নিবে যায়, শরীরের রক্ত চলাচল কেমন যেন থেমে থেমে থাকে, বুক ভার ভার ঠেকে, নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়; ভাল করে নিশ্বাস ফেলতে শ্বাস নিতে ঘন ঘন হাই তোলে ও তখন; আর যেন হাই তুলতে গিয়ে হৃদপিণ্ডে ফুসফুসে চাপ পড়ে চোখের কিনারে জল জমতে আরম্ভ করে। বিশ্রী! জয়ন্তী কি এখন আবার তা হতে দেবে। চোখের জলে এমন সুন্দর করে আঁকা কাজল ধুয়ে গলে একাকার হয়ে যাবে না! মিটিং শেষ করে, কি মাঝখানেও অরুণ হয়তো আবার আসবে; আবার চোখ দেখে সুন্দর উপমাটা তো তা হলে ওর দেওয়া হবে না। না, তা হতে পারে না। তা হতে দেব না। এক প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি নিয়ে জয়তী দুপায়ের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়াল, আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে চাঁপা ফুলটা চুলে গুঁজল, ঠোঁট দিয়ে নীচের ঠোঁটটা দুবার চাটল। ইচ্ছা-শক্তি। এর জোরেই তো সে বেঁচে গেছে, বেঁচে আছে। না হলে লক্ষ্ণৌর অন্ধকার দিনগুলি, একটানা আড়াই বছরের ক্লান্তি, কিছু-না-হতে-পারার মৃত্যু সে পার হয়ে আসতে পারত! কখনই না।

সব ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে আঁচলটাকে শক্ত করে ও কোমরে জড়িয়ে নীচে ভাঁড়ার ঘরে যেতে তৈরি হল। জলখাবারের প্লেটগুলি এইবেলা আস্তে আস্তে সাজাতে আরম্ভ করতে হয়। তপতী কি সকলের আগে তার চমৎকার গল্পটা পড়বে, না সকলের পড়াটড়া হয়ে গেলে তাকে পড়তে ডাকবে? অরুণ, বেশ মনোযোগ দিয়ে তুমি ওর গল্পটা শুনো কিন্তু। জয়তী নিজের মনে হাসে। মাথার চাঁপা ফুলটার গন্ধে দেখতে দেখতে সত্যি আবার ও কেমন তাজা হয়ে উঠেছে। তপতীর পড়ার ঘর থেকে বেরোবার সময় আস্তে ও দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সিঁড়িতে নামল।

॥ তেরো ॥

যেন সাহিত্যিকদের চেয়ে অসাহিত্যিকরাই বেশি বক্তৃতা করলেন, প্রবন্ধ পড়লেন। অসাহিত্যিক তুমি তাঁদের বলতে পার না, কেননা সাহিত্য তাঁদের পেশা না হলেও সাহিত্য বোঝেন পড়েন চর্চা করেন, এ তুমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবে না। তা না হলে অরুণের বাবা ব্যারিস্টার ভবতারণ ব্যানার্জি সংস্কৃত নাটক 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'-এর ওপর এমন চমৎকার আলোচনা করেন কি করে! অ্যাডভোকেট নন্দী সক্রেতিসের সাহিত্য-সাধনা নিয়ে একটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখে এনে তা আসরে পড়লেন। এক ডজন অধ্যাপকের মধ্যে সাত-আটজনই বাড়ি থেকে লিখে আনা এক-একটি রচনা পাঠ করলেন। সবই অবশ্য সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ওপর লেখা। ইঞ্জিনিয়ার সোমের স্ত্রী বাংলার নারী-জাগরণের ইতিহাস আলোচনা করলেন। কিন্তু সকলকে অবাক করে দেন জাস্টিস রাধারমণ। রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা' নিয়ে তিনি যখন আলোচনা করতে লাগলেন তখন আসরে সকলে একবাক্যে স্বীকার করলেন, আইন-আদালত ছাড়াও তিনি এমন একটা জগতে বাস করছেন যেখানে রস, সৌন্দর্য ও অধ্যাত্ম-সাধনা নিয়মিতভাবে চলছে। বস্তুত রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে এমন সরস বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা অনেক পণ্ডিত অধ্যাপকও করতে পারেন নি, আসরে কেউ কেউ বলছিলেন। প্রবন্ধ পড়া শেষ হতে কবিতা পাঠ আরম্ভ হল। প্রভুদয়াল বসু-মল্লিক তাঁর বাবরি দুলিয়ে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করলেন, শাস্ত্রী-গিন্নী রেবা স্বরচিত কবিতা পড়লেন, তপতীর কলেজের বান্ধবী দুটি মেয়ে কবিতা পড়ল। তারপর গল্প। অনাদি সাহা সত্যিকারের 'ছোটগল্প' আয়তনে কত ছোট হতে পারে তার

দৃষ্টান্ত হিসাবে নিজের লেখা একপৃষ্ঠার একটি গল্প পড়লেন। নীলাদ্রি বড়গল্প পড়লেন। তপতী গল্প পড়ল। তপতীর গল্প শুনতে শুনতে ব্যোমকেশ গাঙ্গুলীর চোখ মুখ উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে লক্ষ্য করে সচ্চিদানন্দবাবু এবং বিভাবতী পরিতৃপ্তির গাঢ় নিশ্বাস ফেললেন। বস্তুত তপতীর গল্প-পড়া শেষ হয়ে যেতে আসরের কোনও কোনও অংশ থেকে করতালি-ধ্বনি উঠতেও শোনা গেল। তপতী ছাড়া আরও একটি মেয়ে গল্প পড়ল। কিন্তু অরুণ শিতিকণ্ঠ জয়দ্রথ রামবিজয় এদের কেউ না পড়ল গল্প না পড়ল কবিতা। এরা আধুনিক নয়, অতি আধুনিক। তাই এদের কিছু পড়তে বলা হল না; আসরের সকলেই বুঝে নিয়ে চুপ করে রইলেন। কেননা সভাপতির ইচ্ছাই এখানে সব। সুতরাং—

সভাপতির ভাষণ আরম্ভ হল। ব্যোমকেশ গাঙ্গুলী বাংলার জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-সংস্কৃতির অতীত ঐশ্বর্য থেকে আরম্ভ করে আজিকার শিল্প-সাহিত্য-জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথায় চলে এলেন। শুধু অতীত নিয়ে আমরা বাঁচব না, আবার নূতনের মোহে অতীতকে বিস্মৃত হওয়াও মূঢ়তার নামান্তর হবে। ঐতিহ্যের ভূমিতে নব সাহিত্য—নব সংস্কৃতির, নূতন ভাবাদর্শের বীজ বপন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমাদের আধুনিক হতে হবে আবার জাতীয় বৈশিষ্ট্য যাতে অম্লান অক্ষত থাকে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। ব্যোমকেশ বললেন, কেবল আধুনিকতার মোহে আধুনিক হতে গেলে আমাদের কি শিল্প কি সাহিত্য কি সংস্কৃতি সকল দিক থেকে দীন দরিদ্র নিঃস্ব হয়ে বিশ্বের দরবারে নিছক একটা ভাঁড়, একটা 'ক্লাউনে' পরিণত হতে দেরি হবে না। সেদিন আর বাঙালীকে চেনা যাবে না, বাংলা-সাহিত্য বোঝা যাবে না— ইত্যাদি।

তারপরই ব্যোমকেশ চলে এলেন বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের গতি-প্রগতির আলোচনায়। চৈত্রের ঝরাপাতার হাহাকার শুনে আমরা যদি মন খারাপ করি ব্যাকুল হই, তবে তা যেমন মূঢ়তা হবে,

তেমনি আধুনিক কালের সাহিত্যে কিছুই হচ্ছে না, কিছুই হয় না ভেবে হতাশ হলেও চলবে না। এই ঝরাপাতার মধ্য থেকে নব অঙ্কুর দেখা যাবে, উচ্ছৃঙ্খলতা উন্মার্গগামিতার ঝোড়ো হাওয়া যখন থামবে তখন দেখব আমাদের সাহিত্য আবার নবপত্রে নবকুসুমে সজ্জিত হয়ে…

একটা গোলমাল শোনা গেল। যেন অতি আধুনিকের দল উত্তেজিত বিক্ষুব্ধ হয়ে ভাষণের প্রতিবাদ করতে উঠছিল। এটা লক্ষ্য করে উল্টো দিকের আসন থেকে কে একজন 'শেম্' 'শেম্' করে উঠল। কেউ কেউ লোকটিকে চিনলেন। অধুনা-লুপ্ত-'কশাঘাত'-সম্পাদক কমল মুখুয্যে। সভাপতির এমন উদার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর এমন উন্নত চিন্তাধারার মধ্যেও যদি কেউ খুঁত ধরতে আসে তবে তার—তাদের সসম্মানে সভা ত্যাগ করে সরে পড়া উচিত। দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে কমল মুখুয্যে আলাদা একটা বক্তৃতা শুরু করে। সচ্চিদানন্দবাবু এবং জাস্টিস রাধারমণ 'কশাঘাত'-সম্পাদক কমল মুখুয্যে এবং শিতিকণ্ঠ-জয়দ্রথের দলকে শান্ত করলেন। ব্যোমকেশ গাঙ্গুলী আবার বলে চললেন: 'পাতাঝরার দিনেও তিনি আজ একটি নবাঙ্কুরের দেখা পেয়ে নূতন আশায় বুক বাঁধতে পারছেন। হবে হচ্ছে। আধুনিক বলতে আঁৎকে ওঠার দিন শেষ হল এবার। সতেরো বছরের মেয়ে তপতী আজ যে গল্প পড়ল তা কেবল ভাষা বা আঙ্গিকে নয়, ভাবের দিক থেকেও মহৎ—মহৎ সৃষ্টি। দেহবাদের ক্লেদ থেকে মুক্ত হয়ে একটি নারীহৃদয় কেমন করে ব্যাপ্তির দিকে অনন্তের দিকে ধাবিত হয় আমরা তার পরিচয় পেলাম। অনন্তের জন্য অসীমের জন্য বালবিধবা রুনির কান্না দেখিয়ে লেখিকা জানিয়ে দিলেন পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার মিলনের মধ্যেই প্রেম যথার্থ পূর্ণতা লাভ করে—আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত "গ্রেট সাহিত্য" সৃষ্টি হয়েছে তার প্রত্যেকটির মধ্যে এই দিব্য-অনুভূতির আলোক, জীবন-দর্শনের—'

জয়দ্রথের কানে কানে শিতিকণ্ঠ বলল, 'আর কি, ব্যোমকেশবাবু আসল কথায় এসে গেছেন, চলো এইবেলা উঠি।'

মুখ বিকৃত করে রামবিজয় বলল, 'বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে বিচার করলে ভদ্রলোকের একটা কথাও ধোপে টিকবে কি!'

'বিচার করে কে।' অরুণ মৃদু হাসল। 'এখানে এরা দলে ভারি কাজেই চুপ থাকা ভালো।'

তরুণ নাট্যকার কৃত্তিবাস বলল, 'আমি ভেবে অবাক হই, আজকের দিনে কলেজে সেকেণ্ড-ইয়ারে পড়ছে একটা মেয়ে এরকম একটা গল্প কী করে লেখে। চাঁপাগাছকে তার যৌবনের সাথী করল—হোয়াট এ সিলি আইডিয়া!'

'এস্‌কেপিস্ট—নায়িকা নয়, যে-মেয়ে এভাবে গল্প শেষ করে আমি তার কথাই বলছি।' ফিসফিস করে জয়দ্রথ বলল, 'অথচ দেখানো হয়েছে মেয়েটি মানে গল্পের নায়িকা তার শরীর সম্পর্কে যথেষ্ট কন্‌সাস ছিল। আর তার বয়স বলা হয়েছে আঠারো থেকে উনিশের মধ্যে।'

'ওই যে, বলা হয়েছে নায়িকা বিধবা।' খসখসে গলায় অরুণ হাসল। 'তার পক্ষে শরীর চাওয়া শরীর দেওয়া পাপ।'

'পাপটা লোকের চোখে—ওটা সংস্কারের প্রশ্ন। কিন্তু মেয়েটির চাওয়াটা তো সত্য ছিল।' কৃত্তিবাস গুমগুমে গলায় বলল, 'আমি ভেবে পাচ্ছি না, সেই সত্যটাকে বিকৃত করে তপতী গল্পটাকে কোথায় নিয়ে দাঁড় করালে। বিশ্বাস করতে বাধে।'

'তা না করলে তো চলবে না।' অরুণ বলল, 'তা না করলে ব্যোমকেশবাবুরা চেঁচিয়ে উঠতেন, বলতেন—'

'আপনারা চুপ করুন, আপনারা চুপ করুন।' ওদিক থেকে কে একজন চেঁচিয়ে ওঠা সত্ত্বেও অরুণ তার কথা শেষ করল: 'এই করে করে ব্যোমকেশের দল বাংলা সাহিত্যের বারোটা বাজিয়ে দিলে। সত্যিকারের জীবন যা হোক, সাহিত্যের জীবন দেখাবার সময়

তুমি তাকে ফুলের মতো শুদ্ধ পবিত্র করে দেখাবে—সেখানে কোনও রকম—'

বাধা দিয়া শিতিকণ্ঠ বলল, 'এইজন্যই সেদিন আমাদের উদয় নাগ বলছিল, জীবন নয়, ব্যোমকেশ গাঙ্গুলীদের পুতুল নিয়ে কারবার। অথচ মুখে তাদের জীবনবোধ জীবন-সত্য ইত্যাদি ভয়ানক বড় বড় বুলি লেগেই আছে।'

'হালে এসব বুলি একটু বেড়েছে, নয় কি?' চন্দ্রমাধব হেসে বলছিল। 'দেশ স্বাধীন হয়েছে, কাজেই সংস্কৃতির ধ্বজাটা উঁচু করে আকাশে তুলে ধরতে হবে, তাই মাতব্বরেরা আদাজল খেয়ে লেগে গেছেন সাহিত্য পরিমার্জনায় সমাজ মেরামতির কাজে।'

'অথচ তারা এটা বোঝেন না পুরনো ঘুণধরা কাঠে পেরেক ঠুকতে গিয়ে তা ফেটে যাচ্ছে, ভেঙ্গে পড়ছে ঝুরঝুর করে।' শিতিকণ্ঠ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

উগ্রপন্থীরা চাপা গলায় যতই বিরুদ্ধ মন্তব্য করুক না, ব্যোমকেশ আধুনিক বাংলা-সাহিত্য কোন পথে যাচ্ছে কোন পথে যাওয়া উচিত এ-সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করতে এতটুকু ইতস্তত করলেন না। ভাষণ শেষ করার আগে আধুনিক লেখিকা তপতী গুপ্তকে সাহিত্য-বাসরের পক্ষ থেকে সভাপতি অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানালেন। তারপর ধন্যবাদ-জ্ঞাপন। তারপর সমাপ্তি-সঙ্গীত। হেনা গাইছিলঃ যাবার আগে যাও গো আমায় রাঙিয়ে দিয়ে যাও—

হাসি উচ্ছ্বাস ও কলগুঞ্জনের মধ্য দিয়ে গ্রীষ্মরাত্রির সাহিত্য-বাসর ভাঙল।

তারপর জলযোগের পালা। সচ্চিদানন্দবাবুর বিশাল ডাইনিং-হলের প্রশস্ত টেবিল ঘিরে বসে নিমন্ত্রিতের দল প্রচুর ফল মিষ্টি

খেলেন, গল্প-গুজব করলেন, তারপর একে একে সবাই বিদায় নিলেন, কেননা রাত বেশি হয়ে যায়।

'আবার আসব, আবার আপনার বাড়ির সাহিত্য-আসরে এসে তপতীর গল্প শুনে যাব।' ভূমেন্দ্রনারায়ণ বিভাবতীর হাত ধরে একবারের জায়গায় তিনবার বললেন, 'ভারি সুন্দর কাটল সময়টা।'

সচ্চিদানন্দবাবু দু'হাত একত্র করেই আছেন। মুখে প্রশান্ত গম্ভীর হাসি।

'আপনাদের সঙ্গ লাভ করে কী যে তৃপ্তি অনুভব করলাম—নিশ্চয়ই আসবেন আবার। এখনি নিমন্ত্রণ করে রাখছি, বর্ষা-মজলিসে যেন আপনাদের পায়ের ধুলো—'

'ছি ছি, গুপ্তমশাই আমাদের লজ্জা দিচ্ছেন। না না, আসব আসব।'

লন খালি করে দিয়ে সাদা কালো সবুজ গাড়িগুলো আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। জয়দ্রথের দল জলযোগের আগেই সরে গেছে। অধ্যাপকের দল ট্যাক্সি করে এসেছিলেন। তাঁরা বোধ করি আবার ট্যাক্সি ডাকতে গিন্নীদের হাত ধরে তাড়াতাড়ি লন পার হয়ে রাস্তায় নেমে গেলেন। সকলের শেষে গেছেন পরাশর ডাক্তার আর 'মহিলা-প্রতিভা'-সম্পাদিকা হেমপ্রভা। হেমপ্রভাকে কিছুতেই পরাশর এত রাত্রে একলা ছেড়ে দিতে রাজী নন। কেননা ট্যাক্সি যে এখন পাওয়া যাবেই তার নিশ্চয়তা নেই। কাজেই—

পরাশর তাঁর ছাই-রঙের টু-সীটারে হেমপ্রভাকে তুলে নিলেন। তেমনি ব্যোমকেশকে আবার গিয়ে চাপতে হয়েছে ভূমেন্দ্রর গাড়িতে। 'লিলি তো এল না, অথচ গাড়িটা নিয়ে তখন এগজিবিশন থেকে বেরিয়ে এলো—আমি তো ভাবলাম এখানে এসে ওকে—' ব্যোমকেশ বিড়বিড় করছিলেন। শুনে ভূমেন্দ্র বললেন, 'তোমার মত তোমার মেয়েও সাহিত্য-পাগলা হবে আশা করছ কেন। বিশেষ ওর বয়স কম। সাহিত্য-সভা ছাড়াও

ওর যাবার, দেখবার অনেক কিছু আছে কলকাতা শহরে—' একটু থেমে ভূমেন্দ্র আবার বললেন, 'আমার তো একেবারেই ইচ্ছা ছিল না—খামকা এসে সন্ধ্যাটা মাটি করে গেলাম।' উত্তরে অবশ্য ব্যোমকেশ বলতে চেয়েছিলেন, 'খামকা সন্ধ্যা মাটি হবে কেন, সচ্চিদানন্দবাবুর গৃহিণীর সঙ্গে তো লাখ দু-লাখ কথা বলা হল। এমন কি, হাত-ধরাধরিটাও বাদ যায় নি।' কিন্তু ব্যোমকেশ কিছু বললেন না চুপ করে রইলেন। ভূমেন্দ্র দুঃখ করলেন, 'পাতিপুকুরের ফাংশানটা মিস্ করলাম। অবশ্য আমি ব্লাড-প্রেসারের রুগী। ওদের জানা আছে।'

॥ চৌদ্দ ॥

তপতী একলা দোতলার করিডরে দাঁড়িয়ে। হাতে একটা বেলফুলের মালা। সভাপতি নিজের গলার মালা তপতীকে পুরস্কার দিয়ে গেলেন। মালাটা হাতে জড়িয়ে তপতী পিছনের বাগানের অন্ধকার দেখছে। যেন কি ভাবছে ও। যেন দৃষ্টিটা উদাস। অথচ একটু আগে সকলের প্রশংসা শুনে শুনে ওর চোখ মুখ কী ঝলমল করছিল।

পায়ের শব্দে তপতী ঘাড় ফেরাল। মা।

'একলা এমন করে দাঁড়িয়ে আছিস যে—জয়তী কোথায়?' বিভাবতী মেয়ের চোখ দেখেন।

'বলতে পারি না, বোধ হয় নীচে—বোধ হয় তেতলায়।' মৃত্যু-মতন একটা ঢোক গিলল তপতী।

'কিন্তু আমি তো অরুণকে দেখলাম না—ও কি আগেই চলে গেছে? ভবতারণবাবু আর তাঁর স্ত্রীকে তো গাড়িতে তুলে দিয়ে এলাম—অরুণ তো ছিল না।' বিভাবতী একবার থামলেন, তারপর বললেন, 'অরুণ কি তোর সঙ্গে একবারও দেখা করে নি?'

'না।' তপতী আস্তে ঘাড় নাড়ল।

'আশ্চর্য।' বিভাবতী বিরক্ত হয়ে আছেন বোঝা গেল। নীচে বাগানের দিকে তিনি চোখ ফেরান। 'সাহিত্যটা কি সব, তা ছাড়া সাদামাটা করে একটা যাহোক কিছু লিখে এনে পড়লেই হত। না, তা তো ওরা করবে না। কেবল দলাদলি। আর এটা তোমাদের বোঝা উচিত কেবল সাহিত্য পড়তে সাহিত্য শুনতে আমি তোমাদের এখানে নিমন্ত্রণ করি নে—সামাজিকতা বলে একটা জিনিস আছে। একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে যেতে দোষ ছিল কি। এমন একরোখা ছেলে!'

তপতী হাতের মালা খুঁটছে। মুখ তুলতে পারছে না। যদি মায়ের দিকে তাকায় ধরা পড়ে যাবে। কেননা তপতীর চোখে হঠাৎ জল এসে গেছে।

নাকি বিভাবতী তা বুঝলেন, বুঝতে পেরে ঘুরে দাঁড়ালেন। 'যাও, একটু বিশ্রাম কর গে। উনি তো লাইব্রেরী-ঘরে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়েছেন। ধকল কি আর কম গেছে! তা ছাড়া প্রেসারের রুগী—দেখছি, জয়তী নীচে আছে কিনা।'

বিভাবতী আস্তে আস্তে নীচে নেমে যান। মা সরে যেতে তপতী চোখ তুলল। তপতীর একবার ইচ্ছা হয়েছিল মাকে বলে দেয় দিদি নীচে নেই—দিদি তেতলায় নেই। অরুণের সঙ্গে জয়তী বাগানে আছে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে দুজন। কিন্তু বলতে গিয়ে থেমে গেছে ও। তপতীর মনে হয়েছে মাকে কথাটা বলার মধ্যে তেমন কী আর আছে! হয়তো মা জানতে পারলে একটু হাসতেন। তপতীর চোখের দিকে একবার তাকাতেন, একবার বাগানের অন্ধকার দেখতেন, তারপর বলতেন, 'এত রাত্রে বাগানে করছে কি ওরা।' ওই পর্যন্ত। কিন্তু তপতী কি মায়ের কাছে তার 'ছোট মনের' পরিচয় দিত না? নিশ্চয় কথাটা তপতীর মুখ থেকে শোনার সঙ্গে সঙ্গে মা তাকে অনুকম্পা করতেন। তপতী যা চিরকাল ভয় করে, এমন কি তার চোখে জল এসেছে এটা পর্যন্ত তপতী মায়ের কাছে লুকিয়েছে। আঘাত যতক্ষণ গোপন রাখা যায়। যেন যত এটা জানাজানি হবে তত তা ওজনে ভারি হবে, বুকে লাগবে বেশি। আশ্চর্য, অস্ফুট গলায় তপতী নিজের মনে বলল, একটা বিকেলের মধ্যে, একটা সন্ধ্যের মধ্যে জয়তীকে এত ভালো লেগে গেল অরুণের। জয়তী আসরে যায় নি, সাহিত্য বোঝে না, ভালো কথা। কিন্তু আসর ছেড়ে হলঘর থেকে বেরিয়ে অরুণ দু'বার-তিনবার করে ও-দিকের করিডর ঘুরে ভিতরে ছুটে এল কেন, কার কাছে এসেছিল ও, তপতী তখনই বুঝে ফেলেছে। জয়তী তখন

তপতীর পড়ার ঘরে ছিল। হ্যাঁ, এ-বাড়ির সবচেয়ে নীরব নিভৃত ঘর।

যেন আর একটা কান্না গলার কাছে ডেলা পাকিয়ে উঠছে। আর দাঁড়াতে পারে না ও। ব্যোমকেশবাবুর দেওয়া ফুলের মালাটা রেলিং-এর বাইরে অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টলতে টলতে তপতী তার ঘরের দিকে চলল। না, অরুণের দোষ নেই, সব দোষ জয়তীর। মনে মনে বলল তপতী, হঠাৎ অরুণকে ভালো লাগবার, অরুণের চোখে নিজেকে ভালো লাগাবার মতন মন জয়তী কোথায় পেল! 'দিদি, তুই এত নিষ্ঠুর!' যেন চিৎকার করে বলতে পারলে তপতীর ভালো লাগত। কিন্তু তা তো করতে পারে না ও। তপতী এখানেও ছোট হতে চাইছে না। ঘরে ঢুকে আলো নিবিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে ও কাঁদতে লাগল। কিন্তু বেশিক্ষণ শুয়ে থেকে কাঁদা হয় না। ভিতরের অসহ্য যন্ত্রণা একসময় তাকে ঠেলে তুলে দেয়, খাট থেকে নেমে ও জানলার কাছে সরে যায়, গরাদে কপাল ঠেকিয়ে বাইরেটা দেখে। অন্ধকার। কিছু বোঝা যায় না। হাওয়ায় বাগানের গাছের পাতার সরসর শব্দ হচ্ছে। যেন গাছের মাথায় মাথায় কি এক গোপন ষড়যন্ত্র চলেছে, ফিসফিসানি শুরু হয়েছে ডাল থেকে ডালে। যা তপতী চিরকাল ঘৃণা করে। চুরি করে কথা বলা চুরি করে তাকানো চুরি করে চাওয়া, শলা-পরামর্শ—তপতী অবাক হয়ে ভাবে, ভালবাসা যদি সূর্যের আলোর মতন উজ্জ্বল স্বচ্ছ, বাতাসের মতন সহজ, আকাশের মতন উদার উন্মুক্ত তো সেখানে লুকিয়ে রাখার লুকিয়ে দেখার চোরের মতো চেপে যাওয়ার কিছু থাকে কি?

কিন্তু তাই তো হচ্ছে, তাই তো দেখছে ও এখন।

রাগে কাঁপতে লাগল তপতী।

'তো তুই মুখ ফুটে বললি নে কেন অরুণকে আমি চাইছি, ও আমার মনে বাসা বাঁধতে আরম্ভ করেছে।' তপতীর চোখ ফেটে

জল এল। 'তুই বলতে পারতিস, আমি স্বেচ্ছায় অরুণকে তোর হাতে তুলে দিতাম ; এই ঢাকঢাক গুরগুরের দরকার ছিল না।' জয়তীর সঙ্গে মনে মনে কথা বলতে গিয়ে তপতী হঠাৎ স্থির হয়ে যায়, পর পর কয়েকটা কথা মনে পড়ে তার, আর বুকের ভিতরটা কেমন হিম পাথর হয়ে ওঠে। বিয়ের পর জয়তী যতগুলি চিঠি লিখেছে তার সব কটায় অরুণের উল্লেখ ছিল। অরুণ বাড়িতে আসে ? ওর সঙ্গে দেখা হয় ? ওর পরীক্ষা কেমন হল ? এবার কি গল্প লিখল ও ? আর সরল মনে তপতী সে সব প্রশ্নের জবাব লিখে পাঠিয়েছে। কিছুই ভাবে নি তখন। তপতীর মনে আছে লক্ষ্ণৌ থেকে জয়তী যত চিঠি দিয়েছে এখানে, মার কাছে বা তপতীর কাছে, প্রত্যেকটা চিঠিতে জানিয়েছে ও, ওর কিছু ভাল লাগছে না, কেন লাগছে না তার কারণও নাকি বুঝতে পারছে না। আজীবন কলকাতায় মানুষ, অন্য শহরে চলে গেছে, তাই জয়তীর মন বসছে না, মা বলত, বাবা বলত, তপতীও তাই ভাবত, এবং বাবা এ-ও বলত, স্বামী, স্বামীর সংসার মেয়েদের কাছে প্রিয়, মধুর ও আপন হয়ে ওঠে তখনই, যখন তারা মা হয়—তার আগে পর্যন্ত মন এমন উড়ু উড়ু করবেই। শুনে মা হাসত, তপতী মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাত। বাবা তার সামনেই এ রকম কথাবার্তা বলে, জয়তী উপস্থিত থাকলে তার সামনেও হয়তো বলতে বাবা ইতস্তত করত না। অত্যন্ত সরল ও স্নেহপরায়ণ মানুষ সচ্চিদানন্দবাবু।

সে সব গেছে—কিন্তু—

আর একটা গভীর বিষয় তপতী এখন ভাবতে লাগল। তার চোখের জল শুকিয়ে গেল। বরং যেন শুকনো বালি পড়ে চোখ দুটো করকর করছিল, জ্বালা করছিল। অথচ সে পলক ফেলতে পারছিল না। সামনের অস্পষ্ট ধূসর দেওয়ালটার দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে ধরে তপতী সমীরবাবুর আকস্মিক মৃত্যুর কথাটা ভাবছিল। অসুখ করেছিল ভদ্রলোকের, কিন্তু তা হলেও কেমন একটা বিশ্রী

গোলমেলে ব্যাপার জড়িয়ে উঠেছিল ওই মৃত্যুর সঙ্গে। মিহিরবাবুর (জয়তীর ভাশুর) টেলিগ্রাম পেয়ে বাবা লক্ষ্ণৌ ছুটে যান এবং একদিন পরেই জয়তীকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় ফেরেন। দিদি খুব কাঁদছিল, বাবা গম্ভীর ছিলেন। মার মুখে তপতী ব্যাপারটা শোনে। ভুল করে জয়তী কি ওষুধ দিতে গিয়ে কি যেন খেতে দিয়েছিল সমীরকে। নিতান্তই চোখের ভুল দিশার ভুল। কিন্তু সমীরের দাদা বউদি মোটেই ঘটনাটাকে হাল্কা করে দেখতে রাজী ছিলেন না। ওটা চোখের ওষুধ। বিষ। খাওয়ার ওষুধ নয়। চোখ খারাপ বলে সমীর মাঝে মাঝে ব্যবহার করেছে। টেবিলের টানার মধ্যে থাকত শিশিটা। ওটা টেবিলের ওপর রাখা খাওয়ার ওষুধের শিশির সঙ্গে মিশে যাবার কথা নয়। এমন কি পুলিসের হাঙ্গামা বাধত এ ব্যাপার নিয়ে, কিন্তু মিহিরবাবু ও সমীরবাবুর বাবা জনার্দনবাবু শেষটায় সব কিছু চেপে যান। স্ক্যাণ্ডাল—দুর্নাম দুটো পরিবারকে পাবে চিন্তা করে তিনি তা করেন। জনার্দনবাবু বাবাকে নাকি বুঝিয়েছিলেন।

মার মুখে সব শুনে তপতীর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। অবশ্য মার মতন তপতীও সেদিন বিশ্বাস করতে পারছিল না জয়তী এমন একটা কাণ্ড করতে পারে। ভুল? তা অসম্ভব নয়। কিন্তু অবাক হয়ে গিয়েছিল ও জয়তীর শ্বশুরবাড়ির মানুষগুলি জয়তী সম্পর্কে এমন একটা ধারণা করেছিল কি করে!

আজ? এখন? সমীরের মৃত্যুটা নতুন করে ভাবতে হচ্ছে তপতীকে। সন্দেহ সন্দেহকে টেনে আনে, অন্ধকার অন্ধকারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। তাই নিয়ম। তপতীর মনে পড়ল লক্ষ্ণৌ থেকে চলে আসার পর জয়তীকে তার মৃত স্বামীর জন্য একদিনও তো কেউ এখানে কাঁদতে দেখল না, মানে স্বামী মরে গেলে এদেশের মেয়েরা এখনও যেমন করে শোক আপসোস করে তেমন একটা হা-হুতাশ অস্থিরতা জয়তীর মধ্যে দেখা গেছে কি?

মাঝে মাঝে অবশ্য গম্ভীর বিষণ্ণ হয়ে থাকে ও। সেই জয়তী এখন বাগানের অন্ধকারে অরুণকে নিয়ে—

তপতী আর ভাবতে পারছিল না।

অস্থির ব্যাকুল হয়ে হাত বাড়িয়ে ও সুইচ টিপে আলো জ্বালল। জয়তীকে নতুন করে দেখতে চাইছে সে, বুঝতে চাইছে। দেওয়ালের দিকে চোখ ফেরাল ও। এক সঙ্গে তোলা দু বোনের ফটো। চার বছর আগের যদিও। এ ওর গলায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। তপতী দাঁত বার করে হাসছে, জয়তীর ঠোঁট বোজা। ওর চোখ হাসছে। চোখ দুটো তন্ন তন্ন করে দেখল তপতী, যেন সেখানে একটা কিছু আবিষ্কার করতে পারছে ও, তারপর জয়তীর থুতনিটা দেখল। চাপা সরু থুতনি। ভুরু জোড়া দেখল। মাঝখানে ফাঁকটা একটু বেশি। তপতীর ভুরুর মতন। কিন্তু তপতীর ভুরু জোড়া চোখের সমান্তরাল হয়ে দুদিকে ছড়িয়ে গেছে। জয়তীর তা নয়। তুলির টানের মতো ভুরু দুটো চোখের দু প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছয় নি, খানিকটা এগিয়ে তারপর চোখ দুটোকে নীচে ফেলে রেখে কেমন একটা বাঁক খেয়ে ওপরের দিকে উঠে গেছে। দিদির এই ভুরু তপতীর ভাল লাগত। আজ আর লাগল না। কাঁকড়াবিছার লেজের ছবি মনে পড়ে যায় তার। ভুরুর শেষ দিকের বাঁকা অংশের সঙ্গে জয়তীর কুটিল মনের মিল দেখতে পেল ও; আর জয়তীর সরু চাপা থুতনির ভিতরেও লক্ষ কথা চাপা আছে না? কেবল চোখ দিয়ে যে-মেয়ে হাসে কথা বলে সে-মেয়ে তো ভয়ংকর হবেই। তপতী একটা গরম নিশ্বাস ফেলল, আলোটা নিবিয়ে দিল। তারপর মুখে আঙুল গুঁজে অসহায় শিশুর মতো জানলার বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল। দশ মিনিট পনের মিনিট কেন, তপতীর মনে হল আধ ঘণ্টার ওপর ওরা নীচে আছে—বাগানে আছে। 'চোর' 'চোর'—চিৎকার করে জয়তীকে ডেকে বলতে পারলে ওর ভাল লাগত, শান্তি পেত, কিন্তু কিছুই

করতে পারছে না ও। অরুণের দোষ নেই, তপতী এই প্রথম আবিষ্কার করল, প্রেমের ব্যাপারে মেয়েদের দোষ বেশি, দোষ মানে নীচতা শঠতা—নির্লজ্জ নিষ্ঠুর ইচ্ছার লাগাম পরিয়ে ওরা পুরুষের ভালবাসা ভাল-লাগাকে কাবু করে ফেলে। অরুণের প্রেম আর কোনও দিন কি তপতীর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারবে। জয়তী সে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে, দিচ্ছে। অরুণ, অরুণকে ডেকে তপতীর এখন বলতে ইচ্ছা হল, কী সাংঘাতিক মেয়ের খপ্পরে পড়েছ তুমি তো জান না।

কিন্তু অরুণকে আজ আর সে পাচ্ছে কোথায়? বাগান থেকে বেরিয়ে ও সোজা বাড়ির রাস্তা ধরবে। ওপরে আসবে না, তপতীর সঙ্গে দেখা হবার লজ্জায়ই আসবে না। কিন্তু কাল, কাল তো দেখা পাব—তপতী মনে মনে ঠিক করল, কাল সূর্য ওঠার আগে ও বালিগঞ্জের বাস ধরবে। গিয়ে অরুণকে সাবধান করে দেবে, বলবে, 'জয়তী স্বার্থপর, শয়তান। আমায় তুমি ভাল না বাস দুঃখ নেই, কিন্তু ভালবাসার নামে তুমি কাঁটাগাছের দিকে হাত বাড়াবে তা আমি সহ্য করতে পারব না। ওর মুখটা ফুল, ফুলের মতো সুন্দর, কিন্তু সর্বাঙ্গে কাঁটায় ভর্তি। কাঁটায় তোমার হাত ছড়ে যাবে অরুণ।'

কথাটা ভেবে তপতী চমকে উঠল। আশ্চর্য, ও যখন নিজের প্রেমের কথা ভাবে, ভালবাসার গল্প লেখে তখন শুধুই মনের কথা ভাবে হৃদয়ের ছবি আঁকে, এখন, জয়তীর বেলায় ও শরীরের কথা, রক্ত মাংসের কথা ভাবছে কেন—না কি ভালবাসার মধ্যে যখন ঈর্ষা এসে মাথা গলাতে শুরু করে তখন হৃদয় মন সরে গিয়ে দেহটাই বড় হয়ে চোখের সামনে এসে ধরা দেয়। তাই তো দিচ্ছে। তপতী এখানে বসে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে বাগানের অন্ধকারে জয়তীর ঠোঁটের ওপর বুকের ওপর অরুণের ঠোট নেমে এল, জয়তীর—

ছবিটা আর দেখতে চাইছিল না ও, দু হাতে চোখ ঢাকল, যেন এক দুঃসহ শারীরিক যন্ত্রনায় তপতী অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল।

॥ পনেরো ॥

মাথার ওপর বৈশাখী আকাশ জুড়ে নক্ষত্রের দীপ জ্বলছে। গোলাপ-ঝোপ বেড়ার মতন দুজনকে ঘিরে আছে। গ্রীষ্মরাত্রির পাতলা মিষ্টি হাওয়া রেশমী রুমাল হয়ে ছুটে এসে এসে দুজনের কপাল গাল গলা চিবুক বুলিয়ে দিচ্ছে। আর ভুরভুর করছে ফুলের গন্ধ। গোলাপ চাঁপা বেল জুঁই বকুল হাস্নুহানা। কোন্ ফুল নেই সচ্চিদানন্দবাবুর বাড়ির পিছনদিকের এই বাগানে! যেন এখানে ফুল ছাড়া আর কিছু নেই আর কিছু থাকবে না ভেবে ওরা দুজন গন্ধে ভরা এই অন্ধকারে নেমে এল। জয়তী চুপ করেছে। অরুণ কথা বলছে।

'আমি বুঝতে পারি নি। আমি কি করে বুঝব তোমার মনের কথা।' অরুণ জয়তীর হাত ধরল। 'বলো?'

'কিন্তু কথা বলার যখন সময় হল ঠিক তখন তুমি ওর হাত জড়িয়ে ধরলে। ওকে দেখলে তোমার গল্প লিখতে ইচ্ছে করে। তাই না? তখন লেকের জলে সূর্যাস্তের লাল রঙ লেগেছে।'

'মনে আছে,' অরুণ বলল, 'আমি তপতীকে সেদিন আশ্চর্য এক মেয়ে মনে করেছিলাম।'

'আর সেদিন থেকে, তখন থেকে হিংসায় আমি ছটফট করছিলাম। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমাকে দেখে অরুণকে একদিন গল্প লিখতে হবে, এমন গল্প ও আর কোনও দিন লেখে নি।' ক্ষীণ গলায় জয়তী হাসল। অরুণ হাসল না। জয়তী বলল, 'পারবে না?'

'পারব।'

'বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু হিংসা বুকে জেগে রইল। বুক পুড়ে যেতে লাগল।'

'এই আড়াই বছর ?'

'হ্যাঁ, আজ বিকেল পর্যন্ত বুকের ভিতর আগুন ছিল। আমি বেশ টের পাচ্ছিলাম।'

'তারপর ?'

'বিয়ে হয়ে আমি সুখী হই নি, আমার দাম্পত্যজীবন দুঃখের ছিল।'

'স্বাভাবিক, কেননা, তোমার মন পড়ে ছিল এখানে, শুধু আমার কথা—' অরুণ থেমে গেল।

অন্ধকারে জয়তী মাথা নাড়ল।

'না, কেবল তাই না, তাহলেও পারতাম, কিন্তু মেয়েদের মনের হিংসা রাগ অভিমান অহংকার সব কিছু ডুবিয়ে দিয়ে ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলার ওকে সব দিক থেকে জয় করার শক্তি সব পুরুষের থাকে না, সমীরের ছিল না।'

'কেন ?' অস্পষ্ট একটা ঢোক গিলল অরুণ।

'তা তুমি বুঝবে না।' অরুণের হাত ছেড়ে দেয় জয়তী। 'তোমার তো আর বিয়ে হয় নি। কাজেই বিয়ের পর একজন কেন সুখী হয় আর একজন কেন দুঃখ পায় তা জানবে কি করে।'

'তারপর ?' এবার একটা বড় ঢোক গিলল অরুণ।

'তারপর থেকে, মানে যখন বুঝলাম, আমাকে কেবল দুঃখ নিয়ে জীবন কাটাতে হবে, আমি ভয় পেতে লাগলাম।'

'তারপর ?' জয়তীর হাত ছেড়ে দিল অরুণ। 'তারপর কী হল !' যেন একটু অস্বস্তিবোধ করছিল অরুণ।

জয়তী হাসল।

'আমি মুক্তি খুঁজতে লাগলাম। মুক্তি চেয়েছিলাম, ঈশ্বর তা পাইয়ে দিলেন।'

কথা বলছিল না অরুণ। যেন হাওয়াটা জোরে বইছিল। পাতার সরসর শব্দ হয়। জয়তী কি ঘনঘন নিশ্বাস ফেলছে ?

অরুণের কাছে আরও নিবিড় হয়ে সরে এল—।

'মেনিঞ্জাইটিস। জান তো কী বিচ্ছিরি অসুখ। আটচল্লিশ ঘণ্টাও পার হল না, সমীর মারা গেল।'

'তবে কি তোমার স্বামীর জন্য একটুও দুঃখ হয় না।' না বলে পারল না অরুণ। জয়তী আর হাসল না।

'মানুষ মরে গেলে নিশ্চয়ই তার জন্য দুঃখ হয়। আবার, যখন আমি আমার মুক্তির কথা ভাবি তখন আনন্দের উল্লাসের শেষ থাকে না।'

অরুণ নীরব।

লক্ষ্য করে জয়তী কেমন করে জানি হাসল।

'আমি কি নিষ্ঠুর? কথা বলছ না!'

'তোমার কথার উত্তর দিতে পারছি না।'

'পেরে কাজ নেই, শোন।' অরুণের দু হাত জড়িয়ে ধরল জয়তী। 'যদি স্বামী মারা না যেত তো তোমায় আমি পেতাম কি করে, নতুন করে আমার জীবন ফিরে পাওয়া হত কি? বল।'

'জীবন সম্পর্কে তুমি অত্যন্ত সচেতন।' অরুণ এবার কেমন করে জানি হাসল।

'হ্যাঁ, আমার জীবনবোধ। মৃত স্বামীর জন্য শোক করে করে আমি নিজেকে মরতে দিতে রাজী নই। পারবে না গল্প লিখতে আমাকে নিয়ে?'

অরুণ একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল। একটু চুপ থেকে কি ভেবে পরে জয়তীর কাঁধের ওপর দু হাত তুলে দিল। 'আমি ভাবছিলাম তপতী কেমন একটা যা-তা গোঁজামিল দিয়ে গল্পটা শেষ করল।'

'করুক।' অরুণের বুকের ওপর মাথা রাখল জয়তী। 'ওর গল্পের নায়িকা রুনি তো আমিই। রুনিকে ও চাঁপা গাছে তুলে দিয়ে গল্প শেষ করতে পারে, কিন্তু আমি তা মেনে নেব কেন—আমার যে—'

'কোনও সত্যিকারের গল্প-লেখক তা মেনে নেবে না—অন্তত আমি এভাবে গল্প শেষ করি নে, উদয় নাগ করে না।' গাঢ় পরিচ্ছন্ন গলায় অরুণ বলল, 'ব্যোমকেশবাবুরা করেন—সেই ছোঁয়াচ আজকের দিনেও কোনও কোনও তপতীর মধ্যে দেখা যায়। ওরা জীবনকে জানে না।'

কথা না কয়ে জয়তী এবার মিষ্টি শব্দ করে হাসে। জলতরঙ্গের বাজনা হয়ে সেই হাসি গ্রীষ্মরাত্রির ফুলের গন্ধভরা অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ে। যেন জয়তীর হাসিটাও একটা সুন্দর গন্ধ।

॥ ষোল ॥

দপ্ করে আলো জ্বলে উঠল। তপতী চোখ খুলল। জয়তী। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছছে, তপতীকে দেখছে।

'মা ডেকে গেল। ঘুমিয়ে পড়েছিলি ? খাবি না ?'

তপতী মাথা নাড়ল।

'ভীষণ মাথা ধরেছে।'

চোখ বড় করে তপতী দিদিকে দেখে। একটু আগে মা খেতে ডাকছিল। তপতী শুয়ে ছিল, ওঠে নি, আলো জ্বালে নি।

'তুই খেয়েছিস ?' তপতী একটা ঢোক গিলল আর বোনকে দেখতে লাগল। যেন নতুন করে দেখছে। জয়তীর চুলে এতবড় একটা সন্থফোটা গন্ধরাজ।

'এই তো খেয়ে এলাম।' তোয়ালেটা ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে রেখে জয়তী আয়নার সামনে দাঁড়ায়, মুখ দেখে, মুখ না, ফুলটা চুলে কেমন মানিয়েছে দেখছে নিশ্চয়। একটা চাপা নিশ্বাস ফেলল তপতী।

'অরুণ—অরুণ চলে গেছে ?' আস্তে প্রশ্ন করল তপতী।

জয়তী ঘুরে দাঁড়িয়ে বোনের মুখ দেখল, যেন একটু অবাকও হল। 'তার মানে! অরুণ কি রাত্রে এখানে থাকবে, না থেকেছে কোনওদিন।' তপতীর চোখের ভিতর স্থির দৃষ্টি ধরে রেখে ক্ষীণ গলায় হাসল ও। 'অরুণ সেই কখন চলে গেছে।'

জয়তীর দৃষ্টি এড়াতে তপতী দেওয়ালের দিকে চোখ ফেরায়, কিন্তু জয়তী তার দিকে একভাবে তাকিয়ে আছে, তার গাল দেখছে, ভুরুর বাঁক দেখছে, নাকের ডগা দেখছে, মানে পরীক্ষা করছে তপতী কিছু ভাবছে কিনা। দিদির দিকে না তাকিয়েও তপতী বেশ টের পেল। বুকের ভিতরটা নতুন করে জ্বলছিল ওর।

'চুপ করে আছিস কেন?' জয়তী কাছে সরে এল।

তপতী ঘাড় নামিয়ে মেঝের দিকে তাকাল।

'যেন কি খুব ভাবছিস?' জয়তী ওর হাত ধরল।

তপতীর ইচ্ছা করছিল ঝটকা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে আনে, তা করল না যদিও, আস্তে হাতটা গুটিয়ে এনে কোলের ওপর রাখল।

তাতেও অবশ্য ওর বিরক্তি প্রকাশ পেল। বুঝতে পেরে জয়তী একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

'কেন, তোর গল্পের তো খুব প্রশংসা হয়েছে। সভাপতি নিজের ফুলের মালা তোকে উপহার দিয়ে গেলেন। অরুণ বলছিল।' জয়তী হাসতে চেষ্টা করল।

'অরুণের সঙ্গে এই নিয়ে বুঝি এতক্ষণ গল্প হচ্ছিল বাগানে দাঁড়িয়ে।' তপতী ভুরু কুঁচকাল।

'এ—ত—ক্ষ—ণ?' যেন আকাশ থেকে পড়ল জয়তী। একটা ঢোক গিলল। 'খুব বেশি সময় তো ছিল না ও বাগানে, আমিও ছিলাম না। বলছিল ছুটো গোলাপ নিয়ে যাব তোমাদের বাগান থেকে, তোমাদের গোলাপগুলি কত বড়। আমি সঙ্গে গেলাম। তখনই তো ফুল নিয়ে ও—'

জয়তীকে বাধা দিল তপতী।

'থাক, আমারই ভুল হয়েছে, ঝোপের পিছনে অন্য কারা ছিল হয়তো।' তপতী জানলার দিকে চোখ ফেরায়। কটমট করে জয়তী আবার তাকে দেখছে, পরীক্ষা করছে; মুখ না ফিরিয়ে তপতী বুঝতে পারে। তপতীর ইচ্ছা করছিল বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়।

'তপতী!'

সাড়া দিল না তপতী। মুখ ফেরাল না। জয়তী আস্তে টেবিলের কাছে সরে গেল। যেন দুর থেকে দেখলে ভাল বোঝা

যাবে তাই সরে গিয়ে টেবিল ঘেঁষে ঈষৎ হেলে দাঁড়িয়ে বোনের মুখটা দেখতে লাগল ও।

এভাবে ওর তাকিয়ে থাকা সহ্য হয় না তপতীর, হঠাৎ সে জয়তীর চোখে চোখ রাখল।

'কি বলছিলি ?' রুক্ষ কণ্ঠস্বর তপতীর।

জয়তী অবশ্য তাতে অবাক হয় না, চোখ নামিয়ে হাতের নখ দেখে, ছোট একটা নিশ্বাস ফেলে, তারপর চোখ তোলে।

'অরুণ ও আমাকে নিয়ে খুব যেন একটা ভাবনা আরম্ভ হল তোর ? হঠাৎ ?'

'যদি কিছু ভাবতে আরম্ভ করে থাকি সেটা কি মিথ্যা ?' তপতী খাট থেকে নেমে দাঁড়ায়। 'আধঘণ্টার ওপর তো দুজনে বাগানে ছিলি।'

'আশ্চর্য !' যেন অস্ফুট প্রতিবাদের ধ্বনি তুলতে চাইছিল জয়তী, তপতী ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল।

'দেখ দিদি, মানুষ সব কিছু লুকোতে পারে না, তুই সব কিছু লুকোতে পারবি যদি মনে করে থাকিস তো সেটা তোর ভুল ধারণা।'

'সব কিছু লুকোনো মানে !' এবার জয়তীর চোখ জ্বলছিল। 'তুই কী বলতে চাইছিস শুনি ?'

'থাক, কথা বাড়াতে চাই না।' তপতী বারান্দায় যেতে চৌকাঠের দিকে পা বাড়াল।

'না না, তোকে বলতে হবে, বলে যেতে হবে সব কিছু লুকোনোটার অর্থ কি, কী আমি লুকিয়ে লুকিয়ে করছি যে তুই জানলি না, মা জানল না, বাবা জানছে না—কদিন হল আমি তোদের এখানে এসেছি ?' জয়তীর গলা কাঁপছিল।

উত্তেজিত হল না তপতী, ঘাড় ফেরাল না, দরজার দিকে চেয়ে রইল, আশ্চর্য ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'হ্যাঁ, আমিই অরুণকে কাল বলে দেব, যদি জয়তীকে ভালবাস, বা ও তোমায় ভালবাসে পরিষ্কার

করে সে কথা আমায় জানিয়ে দাও, আমি কুয়াশার মধ্যে কোনও আবরণের ভিতর থাকতে চাই না। প্রেমের ব্যাপারে লুকোচুরি খেলা আমি পছন্দ করি না। যারা খেলে তাদের নর্দমার কীটের মতো ঘৃণা করি।' তপতী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'নর্দমার কীটের মতো ঘৃণা করি।' অস্ফুট গলায় জয়তী আবৃত্তি করল। আবৃত্তি করল আর ঘুরে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখল। চোখ দুটো তখনও জ্বলছে। কিন্তু চোখ দেখছে না ও। দেখছে অরুণের নিজের হাতে গুঁজে দেওয়া মাথার গন্ধরাজটা। ফুলটা চুল থেকে খুলে ফেলে ও হাতের মুঠোর মধ্যে রাখল। একটু চাপ দিল। যেন অরুণকেই মুঠোর ভিতর এনে ও শক্ত করে ধরেছে। এই অনুভবের প্রয়োজন আছে, জয়তী ভাবল, কেননা এখন থেকেই তপতী হিংসায় জ্বলছে ; কিন্তু এই জ্বলুনির দাম কি ? জলো প্রেমের জ্বালাও ক্ষণিকের, ঈর্ষার হিংসার আগুন দপ্ করে জ্বলে উঠতে না উঠতে নিভে যায়, কাউকে পোড়ায় না, নিজেও পোড়ে না। হাসল জয়তী। নরকের কীট! এ যেন 'আঙুর ফল টক' বলে মুখ ফেরানো, তবু তো আঙুরের থোকার নাগাল পেতে শেয়ালটা লাফালাফি করেছিল। আর তুই? আড়াই বছর, বেশি, পুরো তিনটা বছর প্রেমের গান শুনলি, ভালবাসার গল্প শোনালি, হাত বাড়িয়ে ভালবাসাকে ধরতে পারিস নি? আজ বড় রাগ হয়েছে দিদির ওপর, অভিমান হয়েছে। হবেই, অক্ষম চিরকালই অভিমানের লাঠি ভর করে হাঁটে। অরুণের দেওয়া ফুলটা জয়তী ব্লাউজের ভিতর পুরল। দামী জিনিস যেমন লোকে বাক্সে তুলে রাখে। এইবার আয়নায় ও নিজের চোখ দুটো দেখল। অসম্ভব জ্বলছে। আরও জ্বলার দরকার, চোখের আরও দীপ্তি প্রখরতা নিয়ে ও চলতে চায়। যে অক্ষম যে অজ্ঞান তার দৃষ্টি অস্বচ্ছ চোখ ঘোলাটে। জয়তী অক্ষম নয় অজ্ঞান নয়। ও জানে অজ্ঞানতাই পাপ, পাপের মধ্যে মৃত্যুর বীজ লুকিয়ে থাকে।

আমি বাঁচতে চাই আমি জীবন চাই। বিড়বিড় করে উঠল ও, তারপর কথাটা মনে হতে মুখের ভিতর আঙুল গুঁজে দিয়ে একটু সময় ভাবল। আয়নায় চোখ নেই আর, মেঝের দিকে, পায়ের আঙুলগুলোর দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে ধরে ও চিন্তা করছিল। অবশ্য তাতেও কিছু এসে যেত না, আয়নায় মুখ দেখে ও ভয় পেত না; কেননা তার ক্লান্তির, বিষণ্ণতার, চোখমুখ হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠার লক্ষণগুলো ক্রমেই কমে আসছে, কমিয়ে এনেছে ও। ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠছে টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও চাপ চাপ রক্ত মুখে ফিরিয়ে আনছে। আনতে পারছে। এখনও তাই হল। যেন কি একটা ঝেড়ে ফেলতে শরীরে ছোট একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ও সোজা হয়ে দাঁড়াল। দেখতে দেখতে ওর সারা মুখে প্রবল রঙের জোয়ার ডাকল। অরুণের হাতে গুঁজে দেওয়া বড় গোলাপটার মত উজ্জ্বল প্রফুল্ল হয়ে উঠল জয়তী। এবার আয়নায় নিজেকে দেখে জয়তী খুশি হল। তপতী তাকে ভয় পাইয়ে দিতে পারল না এই ভেবেই সে খুশি হল বেশি। বরং সে তৈরী হল ভাল করে তপতীকে কথাটা জিজ্ঞেস করবে। সব কিছু লুকোচ্ছি আমি! দু কাঁধের ওপর জয়তীর সুন্দর গ্রীবা ও সুছাঁদ কবরী সমেত মাথাটা দুলতে লাগল। সাপের ফণা যেমন দোলে। টেবিল ছেড়ে দরজার কাছে চলে এল ও। চৌকাঠ ডিঙিয়ে বারান্দায় এল। তপতী নেই। একটু অবাক হল ও। তারপর আর অবাক হল না। ওপরে লাইব্রেরী ঘরে আলো জ্বলছে। বাবা অনেকক্ষণ হল নীচে নেমে এসেছেন। তাহলে তপতী ওপরে গেছে। জয়তী তেতলার সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। দ্রুত নিশ্বাস পড়ছিল তার। আর, আর ফণার মত মাথাটা দুলছিল। যদি তপতীর কাছে সদুত্তর না পায়, সব কিছু লুকোনো বলতে ও কি বোঝাতে চাইছে পরিষ্কার করে দিদিকে না বলে তো জয়তী ঠিক ছোবল বসিয়ে দেবে, সবটুকু বিষ ছোট বোনের ওপর ঢেলে দিয়ে তবে শান্তি।

না, অরুণকে নিয়ে নয়, ওর সঙ্গে তো ভালবাসার খেলা আজ সন্ধ্যা থেকে শুরু হল জয়তীর—তপতী অন্য কিছু বলতে চাইছে। আমিই তোকে বলব, আমি সব হেঁয়ালী ভেঙে দিচ্ছি, তপতী। যেন কথাটা জিভের ডগায় ঝুলিয়ে প্যাসেজ পার হয়ে জয়তী ওপরের বারান্দায় উঠে গেল।

টেলিফোনের রিসিভার হাতে তপতী দাঁড়িয়ে। চোখের কোণায় জল। জয়তী অবাক হল কি ? অবাক হতে গিয়েও ও সামলে নিয়ে মৃদু হাসল। এক পা এক পা করে তপতীর সামনে এসে দাঁড়াল।

'এত রাত্রে কাকে ডাকছিস ?'

দিদির কথার উত্তর দেয় না তপতী। কানে রিসিভার ঠেকিয়ে আড় চোখে সাদা দেওয়ালটা দেখে।

'কাকে চাইছিস ?' বেহায়ার মতন জয়তী আবার প্রশ্ন করল। দেওয়াল থেকে এবারও চোখ সরাল না তপতী। চোখ না সরিয়ে মৃদু গলায় বলল—'অরুণকে।'

'এখন!' জয়তীর বাঁকা ভুরু আর একটু বেঁকে গেল। 'নিশ্চয় ও খেয়ে-টেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'মিসেস ব্যানার্জি সাড়া দিয়েছেন। অরুণকে ডেকে দিচ্ছেন।' তপতী এবার চোখ সোজা করে জয়তীর মুখ দেখল। বিষণ্ণ গম্ভীর চেহারা তপতীর। জয়তী একটা ঢোক গিলল।

'কাল তো ও আসতই, কিছু বলার থাকলে কাল বললে পারতিস।' জয়তী বিড়বিড় করে উঠল। 'ঘুম থেকে ডেকে তুলে ওকে কষ্ট দেওয়ার কোন মানে হয় ?'

হাতের তেলো দিয়ে মাউথপীস চেপে ধরল তপতী।

'কাল পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে পারছি কই, জয়তী। আজই বলতে হবে, এখনই বলতে হবে, না হলে রাত্রে ঘুমোতে পারব না আমি।'

উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল তপতী। দু কান লাল। জয়তী নীরব।

'হ্যালো, অরুণ ?—আমি তপতী।'

'এত রাত্তিরে!' সদ্য ঘুম ভাঙা অরুণের অবাক কণ্ঠস্বর শুনতে পেল তপতী। তপতীর কান আরও লাল হয়, ভুরু কুঁচকে ওঠে।

'হ্যাঁ, রাত্তিরেই ডাকতে হল তোমাকে, জয়তীর সঙ্গে আমাদের বাগানে কতক্ষণ ছিলে, পনেরো মিনিট ? বিশ মিনিট ? আধঘণ্টা ? আরও বেশি। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের কাছাকাছি, কেমন না ?'

উত্তরে অরুণ কি বলল জয়তী শুনল না, কটমট করে তাকিয়ে ও তপতীকে দেখছে, তপতী কী বলছে শুনছে, যেন নিশ্বাস ফেলতে ভুলে রইল ও।

'হ্যাঁ, সে-কথাই জিজ্ঞেস করছিলাম, খুব ভাল।' অরুণের কথা শুনে তপতী বুঝি হাল্কা নিশ্বাস ফেলল, তাই প্রায় থুতনির সঙ্গে মাউথপীসটা ঠেকিয়ে প্রখর পরিচ্ছন্ন গলায় ও বলতে পারল, 'তা হলে ঠিক হয়ে গেল আজ থেকে আমাদের সম্পর্কের এইখানেই শেষ, কেমন, তাই না ? চুপ করে আছ কেন, অরুণ!'

এবার জয়তীর ঠোঁটে হাসি উঁকি দিয়েছে, চোখের মণি দুটো জ্বলছে, কিন্তু এখনও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না ও, স্থির দৃষ্টি মেলে ধরে ছোট বোনকে দেখছে।

'আর কি, হয়ে গেল, অরুণকে শেষ কথা বলা হয়ে গেল তপতী, এখন ছেড়ে দে, বেচারা ঘুমিয়ে পড়ুক'—যেন বলতে যাচ্ছিল জয়তী, চমকে উঠল।

'হ্যাঁ, আমিও শেষ কথা বলে রাখছি অরুণ।' তপতীর নাকের বাঁশী নতুন করে ফুলে উঠল, থুতনিটা শক্ত হয়ে গেল; লম্বা আঙুলগুলোকে আঁকসির মতন বেঁকিয়ে আরও শক্ত করে রিসিভারটা চেপে ধরে প্রায় চিৎকার করে বলল ও, 'কী ভীষণ ধূর্ত

শঠ শয়তান মেয়ের পাল্লায় পড়েছ অরুণ তুমি জান না, লক্ষ্ণৌয়ে জয়তী কি সব কীর্তি করে এসেছে, শোন তা হলে বলছি—'

'আমি বলছি, আমায় দে, আমি অরুণকে বলব।' বাজের মতন ছোঁ মেরে জয়তী তপতীর হাত থেকে রিসিভারটা তুলে নেয়, ঘনঘন নিশ্বাস পড়ছে তার, মাথাটা আবার ফণা হয়ে তুলছে, তা হলেও কেমন শান্ত মসৃণ গলায় ও বলতে আরম্ভ করল, 'হ্যাঁ, অরুণ, আমি জয়তী কথা বলছি—'

তপতী বাধা দেয়। জয়তীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত দিয়ে ওর মুখটা চেপে ধরে এমন। বোনের হাত সরিয়ে দিয়ে জয়তী হাসল।

'কেন, আমি কি অরুণকে বলতে পারব না ভেবেছিস তুই, আমার সেই সাহস আছে।' জয়তীর গলার হাসি এবার রুপোর ঘণ্টা হয়ে বাজছে। 'বলব, অরুণ, তোমার জন্যই একাজ করতে হল ; বলব, আমি যদি নিষ্ঠুর না হতাম, যদি স্বামীকে বিষ না দিতাম তো তোমায় আমি পেতাম না যে, নতুন করে আমার জীবন ফিরে পাওয়া হত না যে, ক্লীবকে আঁকড়ে থেকে সারাজীবন দুঃখ পাওয়ার—' জয়তীর শেষ কথাটা কেমন অস্পষ্ট শোনায়।

'মিথ্যাবাদী!' থরথর করে কাঁপছিল তপতী, গলার স্বর বিকৃত হয়ে গেল ওর : 'নিজের দুষ্কৃতি ঢাকতে কলঙ্ক ঢাকতে এখন অনেক কিছু বানিয়ে বলা হবে, আর তাই কিনা অরুণের সামনে ফলাও করে ধরে তাতে ভালবাসার রঙ লাগানো হচ্ছে প্রেমের পুলটিস মুড়ে দেওয়া হচ্ছে। দুষ্টু, শয়তান মেয়ে—'

'ভীরু কাপুরুষ।' জয়তীও গলার স্বরটাকে বিকৃত করে ফেলল : 'প্রেমের—ভালবাসার তুই কতটা বুঝিস, কী জানিস—'

'আশ্চর্য!' শব্দ করে বিভাবতী এসে দরজায় দাঁড়ান। 'দুপুর রাতে কি নিয়ে দু বোনের ঝগড়া হচ্ছে শুনি—এত রাত্রে কার সঙ্গেই বা টেলিফোনে কথা হচ্ছে?'

মুহূর্তকাল স্থির স্তব্ধ থেকে তিনি দুই মেয়েকে দেখেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন সব কিছু বুঝে নেন। ঘাড় ফিরিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে চোখ রেখে বিভাবতী আক্ষেপের সুর বার করলেন: 'অরুণকে নিয়ে কামড়া-কামড়ি আরম্ভ হয়েছে দুজনের। তা ভবতারণ ব্যানার্জির ছেলে অরুণ এমন কিছু একটা সুপাত্র না যে তার জন্য চুলোচুলি করে মরতে হবে দু বোনের। এই মাত্তর কর্তাকে কথাটা বলছিলাম। জাস্টিস রাধারমণের দাদার ছেলে নীরদকে আজ দেখলাম, কাকাবাবুর সঙ্গে সাহিত্য-বাসরে এসেছিল। স্টেট স্কলারশিপ পেয়ে বিলেত যাচ্ছে—তেমনি চমৎকার স্বাস্থ্যটি। আর ভবতারণের ছেলে? না আছে এদিক না আছে ওদিক —অরুণের কি কোনকালে ফরেন্ যাবার সম্ভাবনা আছে—কোনদিনও না। সাহিত্য—সাহিত্য করে যে ছাই কী হবে—'

বলতে বলতে, যেন খুব বিরক্ত হয়ে বিভাবতী আবার নীচে নেমে গেলেন।

জয়তী আস্তে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

তপতী দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদছিল।

॥ সতেরো ॥

লিলি গাড়িটাকে একটা নির্জন মাঠের কিনারে এনে দাঁড় করায়। গ্রীষ্মরাত্রির কালো আকাশ ভরে তারার ফুল ফুটে আছে। দুজন গাড়ি থেকে নেমে ঘাসের ওপর পা রাখল।

'বস্তুত মেয়েরা যখন নেশা করে আমার ভাল লাগে।' লিলির কাঁধের ওপর হাত রাখল উদয়। 'তোমার চোখ দুটো যে এখন কত সুন্দর লাগছে—'

অল্প হাসল লিলি।

'আর আমি কেবলই ভাবছি তোমার গল্পের সেই নায়িকার কথা। মেয়েগুলো ভীষণ বোকা। কেন যে ওরা ভালবাসতে যায়, বিয়ে করতে যায়—'

'তুমি কি—' উদয় হঠাৎ থামল, যেন আহত হল একটু, তারপর আস্তে বলল, 'বিয়ের কথা আমি তুলছি নে; প্রেম, ভালবাসা—তুমি কি কাউকে ভালবাসছ না, বাসতে পারছ না?'

'না তো!' উদয়ের হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে লিলি জোরে হেসে উঠল। 'তাই আমি বলছি নাকি, পারি ভালবাসতে, কিন্তু বাসব না, হি-হি।'

'অদ্ভুত মেয়ে তো।' উদয় আর চমকে ওঠে না, হাসে: 'তার মানে ভালবাসার মতন মানুষের দেখা আজও পাও নি, এই তো?'

'হোপ্‌লেস।' উদয়ের হাত ছেড়ে দিয়ে লিলি ঝুপ্ করে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। 'আমার আধখানা বুঝেছ তুমি, আধখানা বোঝ নি।' আকাশের দিকে মুখ ঘুরিয়ে লিলি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'বেশ তো বাকি আধখানা বুঝিয়ে দাও।' ওর মাথাটা কোলের কাছে টেনে নেয় উদয়, চুলে হাত বুলোতে থাকে।

লিলি কথা বলে না, যেন ওর ঘুম পাচ্ছে, আদর পেয়ে দু চোখ জড়িয়ে আসছে। মাঠের ঠাণ্ডা হাওয়ায় উদয়েরও চোখ জড়িয়ে আসছিল।

লিলি হঠাৎ চোখ খুলল। খিল খিল করে হাসল।

'বুঝলে, সংসারে এমন মানুষও আছে যে কবিতা লিখতে পারে কিন্তু লেখে না, ছবি আঁকতে পারে কিন্তু আঁকে না, ভালবাসতে পারে কিন্তু বাসবে না। আমি সেই মানুষ। বিশ্বাস কর।'

'মানে তোমার যা-কিছু ভাল নিজের মধ্যে ধরে রাখতে চাও। আর কাউকে দিতে দেখাতে ভাগ বসাতে রাজী নও, এই তো?'

'নিশ্চয়, আমার ভাললাগা ভালবাসা নিয়ে আমি নিজেই বুঁদ হয়ে থাকতে চাই।'

'বুনো ফলের মতন ফুলের মতন। তোমার রস গন্ধের নাগাল কেউ পাবে না।' উদয় বিড়বিড় করে উঠল।

লিলি আর হাসে না। আকাশের তারার দিকে চোখ রেখে নিজের মনে বলল, 'ভালবাসাবাসিটা বড্ড সেকেলে হয়ে গেছে, আর যত অশান্তি উপদ্রব ওটার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। চারদিকের কাণ্ডকারখানা দেখে দেখে আমার কেমন ঘেন্না ধরে গেছে।'

উদয় নীরব।

'রাগ করলে?' লিলি তার হাত ধরে আস্তে ঝাঁকুনি দেয়।

'মোটেই না।' উদয় ওর নরম আঙুলগুলো মুঠোর ভিতর চেপে ধরল। 'অত্যন্ত স্বচ্ছ তোমার দৃষ্টিভঙ্গি, পরিচ্ছন্ন; হীরের মত ঝকঝকে সুন্দর একটি মনের পরিচয় পেয়ে আমি যে কী খুশি হয়েছি আজ।' উদয় ওর থুতনির ওপর আঙুল বুলোয়। 'আমি অবাক হয়ে ভাবি তোমার বাবা ব্যোমকেশ গাঙ্গুলী—'

লিলি একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'বাবার চিন্তা এসবের ধারে কাছে দিয়ে যায় না। এমন বিচ্ছিরি লাগে যখন চিন্তা করি বাবা সাহিত্য করে গাড়ি বাড়ি

করেছে। তার চেয়ে—তার চেয়ে যদি তেল কয়লার ব্যবসা করত ব্যোমকেশ গাঙ্গুলী তবু আমি কিছুটা গৌরব বোধ করতে পারতাম।'

কথা না কয়ে উদয় নাগ সিগারেট ধরায়।

আর এদিকে ভেবে মরেন সুধাময়ী। খুব অস্বস্তি বোধ করছিলেন তিনি। এই নিয়ে দশবার তিনি রাস্তার দিকের বারান্দায় ছুটে গেছেন, ঘাড় নামিয়ে নীচের রাস্তা দেখেছেন, তারপর ঘাড় তুলে আকাশের তারাদের ঘুরে যাওয়া দেখেছেন; তারপর বুঝি ঘাড় ফিরিয়ে দেওয়ালের বড় ঘড়িটার কাঁটা ছুটোর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছেন এবং তারপর এক পা এক পা করে আবার ঘরে ঢুকেছেন। ঢাকনা পরানো আলোর সামনে মাথা গুঁজে ব্যোমকেশ তাঁর নতুন উপন্যাসের প্রুফ দেখছিলেন।

'আমি বুঝতে পারছি নে মেয়েটার আজ হল কি, কোথায় গেছে ও!' কেমন যেন আর্তনাদের সুর বার করছিলেন সুধাময়ী। 'রাত বারোটা বাজে, ঘরে ফেরার নাম নেই—'

'কী যন্ত্রণা, কী যন্ত্রণা!' ব্যোমকেশ বিরক্ত হন। এই নিয়ে পাঁচবার গৃহিণী টেবিলের কাছে তাঁকে জ্বালাতন করতে এসেছে। এবার ব্যোমকেশ জোরে ধমক লাগান। 'মরুক গে তোমার মেয়ে। তোমার মেয়ের কথা ছেলের কথা তোমার কথা ভাবতে গেলে কাল সকালে প্রেসে প্রুফটা পাঠানো হবে না। সরো—সরে যাও এখান থেকে—'

ধমক খেয়ে সুধাময়ী যখন সরে যাচ্ছিলেন তখন ব্যোমকেশের টেবিলে টেলিফোন ক্রিং ক্রিং করে উঠল। 'আর এক উপদ্রব।' বিড়বিড় করে ব্যোমকেশ রিসিভার তুলে ধরেন।

'হ্যালো—ভূমেন্দ্র? হ্যাঁ হ্যাঁ আমি, কী ব্যাপার! কী বলছ? অ্যাঁ……কখন?……ডেড্……ও হসপিট্যালে নিয়ে গেছে!'

ব্যোমকেশের হাতের রিসিভার একটু কেঁপে উঠে আবার স্থির হয়ে গেল। 'তা তুমি কি করে এর মধ্যেই খবর পেলে?……কে, বিভাবতী?……ও সচ্চিদানন্দ……হ্যাঁ হ্যাঁ……তাও বটে……তা রিকোয়েস্ট করবেন বইকি—সুইসাইড করার চেষ্টা, এ তো পরিষ্কার বোঝা যায়, আর এ-খবর যাতে তোমাদের খবর-কাগজে ছাপা না হয় তার জন্য তো ভদ্রলোক তোমাদের অনুরোধ করবেন জানা কথাই—কেলেঙ্কারি—কি আর করবে, চেপে যাও, ছাপবে না ওই খবর। তা তো বটেই, সচ্চিদানন্দ আমাদের বন্ধুস্থানীয়।' ব্যোমকেশ শব্দ করে হাসেন: 'তা বলে সাহিত্য-বাসরের খবরটা ছাপতে যেন আবার ভুলো না……এ্যাঁ, কি বললে? চলে গেছে? ও, ছাপা হয়ে গেছে……তা তো যাবেই, ভূমেন্দ্রনারায়ণ যে-বাসরের চীফ গেস্ট……আরে আমাকে আর কজন চেনে, দেশের লোক তোমাকেই এখন জানে বেশি, হাঃ হাঃ—এটা কাগজের যুগ…… হ্যাঁ……দেখি কাল সকালে যদি একটু সময় করতে পারি, যাব একবার সচ্চিদানন্দর ওখানে…… আচ্ছা ছেড়ে দিচ্ছি……ছেড়ে দিলাম।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ব্যোমকেশ হাতের পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মোছেন। সুধাময়ী এগিয়ে আসেন। তাঁর চোখে ভয়, বিস্ময়।

'কাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল—সচ্চিদানন্দবাবুর বাড়ির কার কি হয়েছে বলছিলে যেন?'

'ছোট মেয়েটা দোতলাব ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েছে।'

'সে কি! এই না তখন এসে বললে, সাহিত্য-সভায় চমৎকার গল্প পড়ে শুনিয়েছিল? কি যেন নাম? তপতী। হঠাৎ এমন করল কেন?'

'কি করে জানব।' ব্যোমকেশ গলার একটা বিশ্রী শব্দ করেন। 'গল্প পড়ে শুনিয়েছিল বলে যে মাথায় ছিট থাকতে নেই সে খবর

তুমি রাখ, না আমি রাখি—আজকালকার ছেলে মেয়ে! ওদের অনেক ব্যারাম—'

'উঃ, কী সাংঘাতিক খবর, কী সাংঘাতিক ঘটনা!' সুধাময়ী বিস্ময়ের মাত্রাটা আর এক ডিগ্রী চড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, ব্যোমকেশ রীতিমত হুঙ্কার ছাড়লেন: 'তুমি এখান থেকে যাবে, না যাবে না। তোমার সাংঘাতিক খবর নিয়ে পড়ে থাকলে আমার কাজটা কখন শেষ করব শুনি?'

সুধাময়ী বেরিয়ে যান। বারান্দার রেলিং ঝুঁকে লিলির পথের দিকে চেয়ে থাকেন।